সাপ্তাহিক সংকলন

দুনিয়ার মানুষ এক হও

রেজিঃ ডিএ ৬০৫৮ | সংখ্যা-২২ | সোমবার, ১০ ভাদ্র ১৪২১, ২৮ শাওয়াল ১৪৩৫, ২৫ আগষ্ট ২০১৪ | ৩২ পৃষ্ঠা ১০ টাকা

দাজ্জালের জান্নাত-জাহান্নাম কমিউনিজমের স্বর্গ-নরক

আফিম তত্ত্বের সত্য-মিথ্যা পৃঃ

ধর্মব্যবসায়ীদের কূপমণ্ডুকতায় ব্যর্থ লেনিনের পরিকল্পনা পৃঃ

সম্পাদকীয়

মুক্তমনা বিপ্লবীদের জন্য সমাজ পরিবর্তনের সঠিক পথ

ইউরোপের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, ঈসা (আ:) এর বিদায় গ্রহণের কিছুদিন পর জনগণের উপর দেশগুলির রাজন্যবর্গ জোরপূর্বক খ্রিস্টধর্ম চাপিয়ে দিয়েছিল এবং চেয়েছিল খ্রিস্টধর্ম দ্বারা তাদের জাতীয় জীবন পরিচালনা করতে। সুতরাং ধর্মযাজকদের হাতে অর্পিত হয়েছিল মানুষের ইহজীবন ও পরজীবনের ফায়সালা। যেহেতু ঈসা (আ:) আনীত শিক্ষায় জাতীয় জীবন পরিচালনার ব্যবস্থাগুলি ছিল না, তাই ধর্মযাজকরাই বিধাতার আসন দখল করে নিয়েছিল। অপরদিকে রাজারাও ছিলেন দুর্দান্ত অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী। উভয়প্রকার স্বৈরাচারী ব্যবস্থার নিষ্পেষণে সাধারণ মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে গিয়েছিল। চার্চ ও রাজারাও পরস্পরের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। এ অবস্থার সমাধানকল্পে মাত্র দু'টি রাস্তাই সমাজচিন্তকদের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল- হয় ধর্মকে অস্বীকার করতে হবে, নয়তো তাকে জাতীয় জীবন থেকে আলাদা করে ব্যক্তিজীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে নির্বাসন দিতে হবে। যেহেতু ধর্মকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা তথা সম্পূর্ণ ইউরোপের জনগণকে নাস্তিক বানিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না, তাই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, মানুষের জাতীয় জীবনে ধর্মের কোনো জায়গা থাকবে না। চার্চ হবে কেবলই প্রার্থনা আর পরকালকেন্দ্রিক। ধর্মকে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় জীবন থেকে এই প্রথম বর্জন করা হল। এ থেকেই জন্ম নিলো এক চরম বস্তুবাদী 'সভ্যতা' দাজ্জাল যা ক্রমে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করল। এই নতুন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা খুব অল্প দিনের ভেতরেই সামন্তবাদ ও রাজতন্ত্রের জায়গা দখল করে নিল। এই পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রভাবে সমাজ আরও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ল। সমাজের এক শ্রেণির লোক রাতারাতি অকল্পনীয় সম্পদ-অর্থবিত্তের মালিক বনে গেল, আর এক শ্রেণির লোক অর্ধাহারে, অনাহারে থেকে জীবনযাপন করতে বাধ্য হল। এ পরিস্থিতি থেকে ইউরোপের অনেক জ্ঞানী-গুণী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিদরা মানুষের মুক্তির পথ সন্ধান করতে লাগলেন। এদেরই অন্যতম হলেন কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস, হেগেলস, লেনিন, লুক্সেমবার্গ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। তারা পুঁজিবাদী নিষ্পেষণ থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে আবিষ্কার করলেন সমাজতন্ত্র। তাদের কিছু কিছু শ্লোগান পুঁজিবাদী শাসনের বেড়িবদ্ধ শ্রমদাস শ্রেণিকে আলোড়িত করেছিল যেমন: কেউ খাবে কেউ খাবে না, তা হবে না-তা হবে না, Workers of the world, unite! বিশ্বের লক্ষ-কোটি জনতা সমাজতন্ত্রকে আলিঙ্গন করে নিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কয়েকদিন পরেই সমাজতন্ত্রের অসারতাও প্রমাণিত হয়ে গেল। জেগে উঠলো উল্টো শ্লোগান: Better dead than red. সমাজতন্ত্রের চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়। যারা এক সময় শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন বুকে ধরে বুর্জোয়া শক্তির বিরুদ্ধে লড়েছেন, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবনকে শেষ করে দিয়েছেন, যারা জীবনে ভালো খেতে-পরতে পারেন নি, এমনকী সমাজ পরিবর্তনের নেশায় বিয়ে পর্যন্ত করেন নি, তারাই আজ পরাজিত শক্তি। তাদের আদর্শের পতন তারা চেয়ে চেয়ে দেখেছেন। এখন তাদের অনেকেই আন্দোলন সংগ্রামকে পরিত্যাগ করে ঘোর পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিকে পরিণত হয়েছেন। মাত্র চারটি দেশ চীন, কিউবা, লাওস আর ভিয়েতনামে সমাজতন্ত্র নামেমাত্র টিকে আছে। সবচেয়ে বড় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র চীন আজ সবচেয়ে বড় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। মোড়ক পাল্টিয়ে আবার ফিরে এসেছে সেই পুঁজিবাদ যা আমাদেরকে দিয়েছে এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা যা প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাল্প শ্রেণি কর্তৃক সংখ্যাগুরুদের দমনের একটা যন্ত্র মাত্র। স্বভাবতই সংখ্যাল্প শোষক কর্তৃক সংখ্যাগুরু শোষিতদের নিয়মিত দমনের মতো একটি বিষম ব্যাপারে সফল হতে হলে দরকার দমনের চূড়ান্ত হিংস্রতা ও পাশবিকতা, দরকার রক্তের একটি সমুদ্র, মানবজাতিকে যেখানে খুঁড়িয়ে চলতে হয় সর্বপ্রকার দাসত্বে, মজুরি দাসত্বে। এটাই বর্তমান পৃথিবীর বাস্তবচিত্র।

যারা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পথ দিয়ে মানুষের মুক্তি কামনা করে হতাশ হয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের কথা হল- 'আপনারা এতদিন যে ধর্মকে দেখে এসেছেন, যাকে আপনারা আফিম বলেন সেটা প্রকৃতপক্ষে আফিমই, কারণ তা মানুষকে বুঁদ করে দেয়। কিন্তু যেটা প্রকৃত জীবনব্যবস্থা- এসলাম, সেটা কার্ল মার্কস দেখেন নি। সেটা কেবল গতিশীলই নয়, সেটা ছিল এমন এক সাইক্লোন যার সৃষ্ট প্লাবন অতি সামান্য সময়ে অর্ধ দুনিয়াকে প্লাবিত করেছিল। সেটা শাসক আর শাসিতকে এক কাতারে নিয়ে এসেছিল। কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের প্রতিটি অঙ্গন থেকে সর্বপ্রকার অন্যায় অবিচার দূর করে চূড়ান্ত শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই প্রকৃত এসলাম আবার এসে গেছে। সেই মহামূল্যবান সত্যের সন্ধান দেওয়ার লক্ষ্যেই এই সংকলনটি আমরা সাজিয়েছি। সত্যিকারের মুক্তমনা বিপ্লবীরা সমাজ পরিবর্তনের সঠিক পথ এতে খুঁজে পাবেন আশা করি।

সূচিপত্র

- বিকৃত বিশ্বধর্ম এবং কার্ল মার্কস্ এর আফিম তত্ত্বের সত্য-মিথ্যা-২
- দাজ্জালের জান্নাত-জাহান্নাম এবং কমিউনিজমের স্বর্গ-নরক-১১
- ধর্মব্যবসায়ীদের কূপমণ্ডূকতায় ব্যর্থ হল কমরেড লেনিনের পরিকল্পনা-১৭
- যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম হোল-২১
- ধর্ম ও নাস্তিক্য: দান ও পুঁজিবাদ- ২৩
- এসলাম বিদ্বেষের পেছনের কথা: অধিকাংশ মিডিয়া দাজ্জাল দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত-২৪
- অন্ধ বিশ্বাস নয়, যুক্তিই ঈমানের ভিত্তি-২৭
- স্বাধীন বাংলার ইতিহাসের সাথে এমামুয্যামানের যোগসূত্র-৩১

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: শাহান পন্নী (রুফায়দাহ)
প্রকাশক : অ্যাডভোকেট আমিনুল হক আকবর। সম্পাদক কর্তৃক মিতু প্রিন্টিং প্রেস, ১০/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়: ২২৩, মধ্য বাসাবো (সবুজবাগ থানা সংলগ্ন) সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪।
ফোন: ০২-৭২১৮১১১, ০১৭৭৮২৭৬৭৯৪, বিজ্ঞাপন বিভাগ: ০১৮১৯২৭৮৭৮২, ইমেইল: desherpatro14@gmail.com

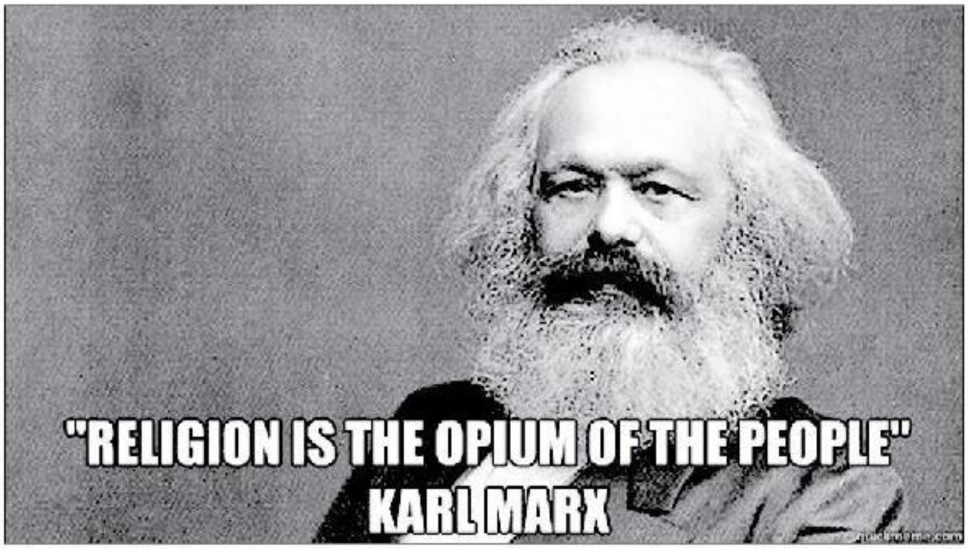

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

বিকৃত বিশ্বধর্ম এবং কার্ল মার্কস্ এর আফিম তত্ত্বের সত্য-মিথ্যা

বর্তমানের তথাকথিত মোসলেম জাতির (জাতি না বোলে বরং একে একটা জনসংখ্যা বলা ঠিক হয়) অবস্থা বর্ণনা কোরতে যেয়ে একে আমাকে ভাগে ভাগে দেখাতে হোচ্ছে। সবগুলি ভাগ দেখানো সম্ভব হবে না কারণ ছোট বড় সব মাযহাব, উপ-মাযহাব, ফেরকা, উপ-ফেরকা, উপ-উপ-ফেরকা একত্র কোরলে মোট কত ভাগ দাঁড়াবে জানি না। তবে আল্লাহর রসুল বোলে গেছেন আমার উম্মাহ্ তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হোয়ে যাবে [হাদিস আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে তিরমিযি, মেশকাত]। কতখানি দুঃখ নিয়ে তিনি তাঁর আজীবনের সাধনায় গড়া জাতি ভেঙ্গে তেহাত্তর ভাগে টুকরো টুকরো হোয়ে যাবার ভবিষ্যদ্বাণী কোরেছিলেন তা ভাবলে বুক ভেঙ্গে যায়। সব মাযহাব ফেরকার বিবরণে না যেয়ে আমি শুধু প্রধান কয়েকটা ভাগের কথা পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা কোরছি। এবার যে ভাগটি সম্বন্ধে বোলতে যাচ্ছি সেটা হলো ভারসাম্যহীন বিকৃত সুফীবাদ অনুশীলনকারী ভাগ।

আল্লাহর দেয়া দীন, জীবনব্যবস্থা ভারসাম্যযুক্ত। এই দুনিয়া, ঐ দুনিয়ার, দেহ-আত্মার ভারসাম্য। এর যে কোন একটাকে কম বা বেশি প্রাধান্য দিলেই ঐ মহা গুরুত্বপূর্ণ ভারসাম্য নষ্ট হোয়ে সমস্ত দীনটা নষ্ট হোয়ে যাবে, এর প্রাণশক্তি নষ্ট হোয়ে যাবে। **ঐ ভারসাম্য ছাড়া পুলসেরাত কেউ পার হোতে পারবে না।** এই জন্যই এই দীনের নবী বোলেছেন এই দীনে (এসলামে) বৈরাগ্য নেই। বোলেই সঙ্গে সঙ্গে বোলেছেন এসলামের সন্ন্যাস শুধু জেহাদে আর হজ্বে (হাদিস)। এ কথার অর্থ হলো এই দীনের মানুষ এই দুনিয়ার কাজ ত্যাগ কোরবে না, বরং পুরোভাবে কোরবে। কিন্তু এই দীনকে, এই জীবনব্যবস্থাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত কোরতে যে সংগ্রাম, তাতে পৃথিবীর যা কিছু আছে সব কোরবান কোরে দেবে। এটাই তার সন্ন্যাস। আবার সেই সংগ্রামের কথা এসে যায়। এর গুরুত্ব এতো বেশি, এতো জরুরি যে, এর জন্য দীনের এক প্রধান নীতি বিসর্জন দেয়া হোয়েছে। পূর্বকালে হজ্ব কোরতে যাওয়া এক দীর্ঘকালব্যাপী বিপদ সংকুল কাজ ছিলো। বহুদূর হোতে হজ্ব কোরতে যাওয়ায় ফিরে আসার নিশ্চয়তা ছিলো না, কাজেই এও দুনিয়া ত্যাগ, সন্ন্যাস ছিলো। যদিও আজকাল হজ্বে আর অনিশ্চয়তা প্রায় নেই।

রসুলাল্লাহর আগমনের আসল উদ্দেশ্য যে সারা পৃথিবীতে সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে আল্লাহর তওহীদভিত্তিক সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করা তা উম্মতে মোহাম্মদী হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি কোরেছিলেন বোলেই ঐ উম্মাহ্ বিশ্বনবীর ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পার্থিব সব কিছু কোরবান কোরে তাদের নেতার উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পূর্ণ কোরতে তারা দেশ থেকে বের হোয়ে পড়েছিলেন। রসুলাল্লাহর ওফাতের ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত তারা একদেহ একপ্রাণ হোয়ে সংগ্রাম চালিয়ে গেলো। তারা বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ কোরল। এরপর ঘোটলো এক মহাদুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। ঐ জাতি হঠাৎ তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভুলে গেলো। জাতি ভুলে গেলো যে কাজের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হোয়েছে, গঠন করা হোয়েছে, প্রশিক্ষণ দেয়া হোয়েছে সেই কাজ ছেড়ে দেওয়া আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। কিন্তু জাতির লোকদের আকিদা অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা বিকৃত হোয়ে যাওয়ায় জাতি ঠিক তাই

> বিশ্বনবীর জীবনের এই যে প্রচণ্ড বহির্মুখী গতি, এই গতি অনিবার্যভাবে সঞ্চারিত হলো তাঁর অনুসারীদের মধ্যে, তাঁর গড়া জাতিটির মধ্যে, কারণ তাঁর উপর আল্লাহর দায়িত্ব, যা এক জীবনে পূর্ণ করা সম্ভব নয়, অর্পিত হলো তাঁর উম্মাহর উপর স্বভাবতঃই। মহানবী তাঁর সাহাবাদের যে আকিদা শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন, সে আকিদার প্রভাবে তারা পৃথিবীতে এক মহাশক্তিশালী বোমের মত বিস্ফোরিত হোয়ে অর্ধেক পৃথিবীতে শেষনবীর দীন প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন।

কোরলো, আল্লাহর দীন সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জেহাদ অর্থাৎ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ত্যাগ কোরলো এবং ত্যাগ কোরে অন্যান্য রাজা বাদশাহরা যেমন রাজত্ব করে তেমনি শান শওকতের সঙ্গে তাদের মতই রাজত্ব কোরতে শুরু কোরলো। লক্ষ্য ভুলে যাওয়ার ফলেই ঐ সংগ্রামের কর্মশক্তির মোড় ঘুরে অন্য কাজে ব্যাপৃত হোয়ে পড়লো এবং দীনে বিভিন্ন দিক থেকে বিকৃতি অনুপ্রবেশ কোরতে থাকলো। একদিকে শুরু হোল আলেম ও ফকীহদের দীনের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, অপরদিকে পারস্য সাম্রাজ্যের পুরাতন ধর্মগুলির বিকৃত অধ্যাত্মবাদ অনুপ্রবেশ কোরল পীর ও মাজারতন্ত্র। **এই মতবাদ এই জীবন-ব্যবস্থার সমষ্টিগত দিকটা, যার মধ্যে আল্লাহর দেয়া রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাগুলি রোয়েছে সেগুলোকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা কোরে শুধু ব্যক্তিগত ও আত্মার উন্নতির প্রক্রিয়াকে আঁকড়ে ধরাকেই ধর্মকর্ম সাব্যস্ত করলো**। একদিকে পণ্ডিতরা ফকিহ, মুফাস্‌সেররা এই দীনের আইন-কানুনকে তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ কোরতে শুরু কোরলেন, অন্যদিকে সুফীরাও সব কিছু সম্পূর্ণ ত্যাগ কোরে নিজেদের আত্মার ধোয়ামোছা পরিষ্কারের কাজে মগ্ন হোয়ে গেলেন। দু'দল দু'দিকে ঝুঁকে পড়লেন। ভারসাম্য আর রইল না, হারিয়ে গেলো। যে কাজের জন্য বিশ্বনবী প্রেরিত হোয়েছিলেন, যে কাজের জন্য তাঁর উম্মাহ সর্বস্ব ত্যাগ কোরে পৃথিবীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, সে কাজ উপেক্ষিত হোয়ে পরিত্যক্ত হলো। জাতি দু'ভাগ হোয়ে দু'দিকে ঝুঁকে পড়লো, উম্মতে মোহম্মদী ঐ খানেই শেষ হোয়ে গেলো জাতি হিসাবে। এই যে দু'টি ভাগ হলো, দু'টি ভাগই হলো অন্তর্মুখী (Introvert)। ফকিহ মুফাস্‌সের ইত্যাদিরা বই, কেতাব, কলম, কাগজ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, আর সুফীরা তসবীহ নিয়ে হুজরায় আর খানকায় ঢুকলেন। একদলের কাজের ফলে জাতি খণ্ড-বিখণ্ড হোয়ে ফেরকা মাযহাব দল উপদলে বিভক্ত হোয়ে ঐক্যহীন হোয়ে গেল, আরেকদলের কাজের ফলে জাতি অন্তর্মুখী, নির্জীব, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হোয়ে স্থবির হোয়ে গেল। অর্থাৎ উভয় শ্রেণির কাজের ফলে ঐ হোল যে, একদা লৌহকঠিন ঐক্যবদ্ধ, দুর্বার, দুর্বিনীত, প্রচণ্ড গতিশীল, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিটি ছিন্নভিন্ন হোয়ে অন্যজাতির গোলামে পরিণত হোল।

ভারসাম্যহীন সুফীরা যে নির্জনতা বেছে নিলেন, যে সন্ন্যাস অবলম্বন কোরলেন **তা এসলামের সন্ন্যাস ছিলো না, সশস্ত্র সংগ্রামের সন্ন্যাস ছিলো না, ছিলো নিজেদের যার যার আত্মার ধোয়া মোছার সন্ন্যাস**। যে বহির্মুখী সংগ্রামের জন্য দুনিয়া ত্যাগের অনুমতি, শুধু অনুমতি নয় আদেশ আল্লাহ ও বিশ্বনবী দিয়েছিলেন, **সুফীদের সন্ন্যাস হলো তার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ অন্তর্মুখী**। অন্যান্য সমস্ত দীন অর্থাৎ জীবন ব্যবস্থা, সমস্ত তন্ত্র, আইন-কানুন বাতিল কোরে দিয়ে এই শেষ জীবন ব্যবস্থাকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরতেই আমি আমার রসুলকে পাঠিয়েছি, এবং এই কথার সাক্ষী আমি স্বয়ং (কোর'আন- সুরা আল ফাতাহ ২৮), **আল্লাহর এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পর নির্জনতার, অন্তর্মুখীতার আর বিন্দুমাত্র স্থান এই দীনে থাকতে পারে না**। আল্লাহর ঐ ঘোষণাকে ভিত্তি কোরে তাঁর নবী ঘোষণা কোরলেন আমাকে আদেশ দেওয়া হোয়েছে **সশস্ত্র সংগ্রাম কেতাল** চালিয়ে যেতে যে পর্যন্ত না সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আল্লাহকে একমাত্র এলাহ অর্থাৎ জীবন বিধাতা বোলে স্বীকার কোরে নেয়, আমাকে তাঁর প্রেরিত রসুল বোলে স্বীকার কোরে নেয়, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় [হাদিস- আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা:) থেকে বোখারী, মেশকাত]। এই যে আল্লাহ তাঁর রসুলের জন্য জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট কোরে দিলেন সে কাজটা হলো সম্পূর্ণভাবে বহির্মুখী, একথা বুঝতে সাধারণ জ্ঞানের বেশি দরকার পড়ে না। আল্লাহর দেয়া ঐ দায়িত্ব এক কথায় নব্যুয়তের দায়িত্ব পালন কোরতে গেলে, সমস্ত পৃথিবীতে এই দীনকে প্রতিষ্ঠা কোরে শান্তি স্থাপন কোরতে গেলে অতি অবশ্যই সংগ্রাম কোরতে হবে। সে সংগ্রাম হোতে হবে প্রচারের সংগ্রাম, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সর্বোপরি সশস্ত্র সংগ্রাম। যাঁর উপর আল্লাহ ঐ বিশাল দায়িত্ব অর্পণ কোরলেন তাঁর জীবনের দিকে চাইলে আমরা কি দেখি? ঠিক তাই, সমস্ত জীবনভর (নবুয়্যত পাবার পর অবশ্য) ঐ সংগ্রাম। রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রচারের সংগ্রাম তো ছিলোই, তার উপর **মাত্র দশটি বছরে আটাত্তরটি যুদ্ধ, অভিযান ইত্যাদি সংগঠন কোরেছেন**, যার মধ্যে আটাশটিতে নিজে সেনাপতিত্ব কোরেছেন, আর স্বয়ং যুদ্ধ কোরেছেন নয়টিতে। একটি মাত্র যুদ্ধের পেছনে কতখানি সংগঠন, প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা প্রয়োজন হয় তা সামরিক বাহিনীর কাউকে জিজ্ঞাসা কোরে দেখতে পারেন। অর্থাৎ **নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বিশ্বনবীর জীবনের প্রধান ভাগ ব্যয় হোয়েছে সশস্ত্র সংগ্রামে**। ভাবলে স্তম্ভিত হোয়ে যেতে হয় যে, ঐ সশস্ত্র সংগ্রামের পরও একটা মানুষ কি কোরে অন্যান্য কাজ কোরেছেন, আর সেই অন্যান্য কাজও কী বিরাট বিপুল কাজ। পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদদের মধ্যে যাদের অন্তরের কিছুটা প্রসারতা আছে, সত্যের প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধা আছে তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর জীবনী পড়ে মানব জীবনের উপর তাঁর প্রভাব দেখে বিস্ময়ে অবাক হোয়ে গেছেন। এমনি অবাক বিস্ময়ে ফরাসী ইতিহাসবেত্তা লা মার্টিন লিখেছেন- "দার্শনিক, বাগ্মী, নবী, আইন প্রণেতা, যোদ্ধা, ধারণাকে জয় ও প্রতিষ্ঠাকারী, বিচারবুদ্ধিসহ বিশ্বাসকে পুনর্জীবনদানকারী, মূর্তিহীন ধর্মের পুনঃপ্রবর্তক, বিশটি জাগতিক সাম্রাজ্যের ও একটি আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা-এই হোচ্ছেন মোহাম্মদ (দ:)। মানবীয় মহত্ব ও বিরাটত্ব মাপার যতগুলি মাপকাঠি আছে সেসবগুলি দিয়ে মাপলে আমরা প্রশ্ন কোরতে পারি- তার চেয়ে বড়, মহীয়ান আর কোন মানুষ আছে?" (History of Turks) আমেরিকান জ্যোতির্বেত্তা, ইতিহাসবেত্তা ও গণিতশাস্ত্রবিদ মাইকেল হার্ট তার "The 100" বইয়ে আদম (আ:) থেকে বর্তমান পর্যন্ত একশ' জন মানুষের লিস্ট, তালিকা কোরেছেন যারা মানব জাতির উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব

বিস্তার কোরেছেন। তাতে সর্বপ্রথম নাম মোহাম্মদ (দ:)। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, মোহাম্মদকে (দ:) এক নম্বর করায় অনেকেই পছন্দ কোরবেন না, কিন্তু সত্যের খাতিরে আমাকে তা কোরতে হোয়েছে।

বিশ্বনবীর জীবনের এই যে প্রচণ্ড বহির্মুখী গতি, এই গতি অনিবার্যভাবে সঞ্চারিত হলো তাঁর অনুসারীদের মধ্যে, তাঁর গড়া জাতিটির মধ্যে। কারণ তাঁর উপর আল্লাহর দায়িত্ব, যা এক জীবনে পূর্ণ করা সম্ভব নয়, স্বভাবতঃই তা অর্পিত হলো তাঁর উম্মাহর উপর। মহানবী তাঁর সাহাবাদের যে আকিদা শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন, সে আকিদার প্রভাবে তারা পৃথিবীতে এক মহাশক্তিশালী বোমের মত বিস্ফোরিত হোয়ে অর্ধেক পৃথিবীতে শেষ নবীর দীন প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন। তখন যারা এই জাতিকে বাধা দিতে এসে ভেঙ্গে খান খান হোয়ে গিয়েছিলো তারা যদি কোনভাবে এই জাতির ঐ বহির্মুখী, সংঘর্ষমুখী, বিস্ফোরণমুখী চরিত্রকে বদলিয়ে অন্তর্মুখী কোরে দিতে পারতো তবে কি হতো? নিঃসন্দেহে বলা যায়, তা হোলে এই উম্মাহ সংগ্রাম ছেড়ে দিয়ে আরবে তাদের যার যার ঘরে ফিরে যেতো, হাতের তলোয়ার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তসবিহ নিয়ে খানকায় ঢুকতো, শত্রুরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাদের পূর্বের অন্যায়, অত্যাচারী জীবন ব্যবস্থায় স্থায়ী থাকতো। **শত্রুরা যা বাইরে থেকে কোরতে পারে নি, অর্ধেক পৃথিবীতে দীন প্রতিষ্ঠার পর ভেতর থেকে ভারসাম্যহীন সুফীরা তাই কোরলেন**। অবশ্য শুধু সুফীরা নয়, আলেম, ফকীহ, মুফাস্সের ইত্যাদি বহু নামের পণ্ডিতরাও তাদের সাহায্য কোরেছেন। সকলের সম্মিলিত কাজের ফল এই হলো যে, জাতিরই আকিদা নষ্ট হোয়ে গেলো, সম্মুখ থেকে বিশ্বনবীর দেখানো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অদৃশ্য হোয়ে গেলো, জাতিটাকে, উম্মাহটাকে হত্যা করা হলো। যে বহির্মুখী কাজের জন্য এই জাতিটাকে আল্লাহ ও তার রসুল সৃষ্টি কোরেছিলেন, অন্তর্মুখী কোরে দেওয়ায় সে উল্টো দিকে চোলতে শুরু করলো। এই উল্টো দিকে চোলতে শুরু করায় এই জাতির আর কোন প্রয়োজন রইলো না। কারণ ঐ অন্তর্মুখীতা, ঐ আত্মার ঘষামাজা কোরে আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রক্রিয়া পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতেও ছিলো। ওয়ায়েস করনী (রা:) তার প্রমাণ। কোন সন্দেহ নেই যে, ওয়ায়েস করনী (রা:) তাসাওয়াফের উচ্চতম স্থানে পৌঁছুতে সক্ষম হোয়েছিলেন, কামেলিয়াত হাসেল কোরেছিলেন। এতে দু'টো বিষয় প্রমাণিত হয়। একটি হলো এই যে- বিশ্বনবীর উপর যখন নবুয়্যত আল্লাহ অর্পণ করেন তখনও পূর্ববর্তী দীনগুলির মধ্যে যে তাসাওয়াফের প্রক্রিয়া ছিলো তা যথেষ্ট ছিলো। দ্বিতীয়টি হলো এই যে- সুতরাং **তাসাওয়াফের প্রক্রিয়ায় আধ্যাত্মিক উন্নতিই যদি দীনের মুখ্য, মুখ্য না হোলেও প্রধান উদ্দেশ্য হতো তবে মোহাম্মদের (দ:) আর প্রয়োজন ছিলো না**। কেননা ঐ সময় ইহুদি, খ্রিস্টান এমন কি দীনে হানিফের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে আহবার, রোহবান অর্থাৎ সুফী সাধক সন্ন্যাসী ছিলেন। সুতরাং একদল সুফী দরবেশ তৈরি করা শেষ নবীর আগমনের উদ্দেশ্য হোতে পারে না। এজন্য রসুলের পুরো জীবনে একটি বারও তিনি মসজিদে নববীতে গোল হোয়ে বোসে আসহাবদের নিয়ে 'আল্লাহু আল্লাহু' বোলে যেকের কোরেছেন এমন নজির কেউ দেখাতে পারবে না। বরং নবুয়্যত পাবার মুহূর্ত থেকে ওফাত পর্যন্ত পৃথিবীর ব্যস্ততম এ মানুষটির জীবন কেটেছে মানুষের মধ্যে, জনকোলাহলে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামে, সশস্ত্র সংগ্রামে- এ ইতিহাস অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

দীনের আলেমরা, পণ্ডিতরা এই দীনের ছোটখাটো কম প্রয়োজনীয় আদেশ-নিষেধগুলি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ কোরে বিভিন্ন মতামত, ফতোয়া সৃষ্টি কোরে উম্মাহকে বহুভাগে বিভক্ত কোরে এর ঐক্য ধ্বংস কোরে দিয়েছিলেন। কোন জাতি যত শক্তিশালীই হোক যদি তার মধ্যে ঐক্য না থাকে তবে কখনও টিকতে পারবে না, কখনও শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হোতে পারবে না, আত্মরক্ষাও কোরতে পারবে না, এটা প্রাকৃতিক নিয়ম, ফিতরাত। প্রাকৃতিক নিয়ম হোল এই যে, ঐক্য অনৈক্যের উপর বিজয় লাভ কোরবে, সু-শৃঙ্খল বিশৃঙ্খলের উপর বিজয় লাভ কোরবে, সাহসী ভীরুর উপর বিজয় লাভ কোরবে। তাই ঐ প্রাকৃতিক আইন মোতাবেকই এই উম্মাহ শত্রুর কাছে পরাজিত হোয়ে কয়েক শতাব্দীর জন্য ঘৃণ্য গোলামে পরিণত হোয়েছিলো। কিন্তু যদি ঐ আলেম, ফকীহ, পণ্ডিতরা এই উম্মাহকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন নাও কোরে দিতেন, তা হোলেও ভারসাম্যহীন বিকৃতি

সুফীদের কাজের ফলে জাতির অন্তর্মুখীতার ফলে জাতি ধ্বংস হোয়ে যেতো, যেমন গেছে। চিন্তাহীন লোক প্রশ্ন কোরতে পারেন- জাতি ধ্বংস হোয়েছে কোথায়? জাতিতো বেঁচে আছে, একশ' ষাট কোটির সংখ্যায় বেঁচে আছে। কোটি কোটি লোক নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, যাকাত দেয়, হজ্ব করে, তাহাজ্জুদ পড়ে। পঞ্চাশটির অধিক ভৌগোলিক রাষ্ট্রে এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তেলসহ পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের একটা প্রধান অংশের এরা মালিক। পৃথিবীময় এই জাতির কোটি কোটি আলীশান মসজিদ আছে, যেখানে কোটি কোটি লোক নামায পড়ে। এই জাতিকে ধ্বংস হোয়ে যাওয়া জাতি কেন বোলছি! বোলছি তার কারণ আছে। প্রত্যেক জিনিসের অস্তিত্বের কারণ থাকে, সেটা হলো সেই জিনিসটার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক কাজের উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্যহীন জিনিসের, উদ্দেশ্যহীন কাজের কোন অর্থ নেই, হোতে পারে না। স্থূল উদাহরণ- আপনার একটি মোটর গাড়ি আছে। এই গাড়ির উদ্দেশ্য হলো আপনাকে বহন কোরে আপনার অভীষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া। এই গাড়ির যন্ত্রপাতিতে যদি এমন গণ্ডগোল হয় যে, সেটা অচল হোয়ে যায়, তবে ঐ গাড়ির আর কোন অর্থ থাকে না। ঐ গাড়িটি যদি মহামূল্যবান গাড়িও হয়, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গাড়িও হয়, তবু ওটা কোন কাজের নয়, কারণ যে একমাত্র কারণে ঐ গাড়িটি তৈরি করা হোয়েছে, আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় স্থানে নিয়ে যাওয়া, সেই কাজটাই ঐ গাড়ি দিয়ে হোচ্ছে না। সুতরাং ওটা অর্থহীন, মহা দামী গাড়ি হোলেও মূল্যহীন। আপনি যদি এত আহম্মক হন যে, গাড়ির উদ্দেশ্যই জানেন না, বুঝেন না, তবে আপনি কি কোরবেন? আপনি এই কোরবেন যে, গাড়ির নির্মাতারা গাড়ির সঙ্গে গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে বই দেয় সেই বই দেখে অতি অধ্যবসায়ের সঙ্গে গাড়ির গায়ে পালিশ লাগিয়ে ওটাকে চকচক কোরবেন, গদীগুলোয় ক্রিম লাগিয়ে নরম আরামদায়ক কোরে রাখবেন। বই মোতাবেক নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে (Point) তেল ও চর্বি (Grease) লাগাবেন। গাড়িটি দেখতে চকচকে, সুন্দর দেখাবে কিন্তু আসলে অচল, কাজেই অর্থহীন। গাড়িটার আসল উদ্দেশ্যই আপনি জানেন না বোলে আপনি মহা সুখী থাকবেন যে গাড়িটা দেখতে ভারি সুন্দর।

ভবিষ্যতে তাঁর উম্মাহর কি অবস্থা হবে বোলতে যেয়ে একদিন আল্লাহর রসুল বোললেন- এমন সময় আসবে যে, এই জাতি পৃথিবীর সব জাতিদের দ্বারা অপমানিত, লাঞ্ছিত, পরাজিত হবে। উপস্থিত সাহাবাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ প্রশ্ন কোরলেন- হে আল্লাহর রসুল! তখন কি পৃথিবীতে তারা এত অল্প সংখ্যাক হবে যে, অন্য জাতিগুলি তাদের পরাজিত ও লাঞ্ছিত কোরবে? মহানবী তাঁর জবাব দিলেন- না, সংখ্যায় তারা অসংখ্য হবে। জবাব শুনে আসহাব নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিস্মিত হোয়েছিলেন। বিস্মিত হবার কথাই। কারণ তখন ঐ ছোট্ট উম্মাহটার ঈমান ইস্পাতের মত, আকিদা সম্পূর্ণ ও সঠিক, উদ্দেশ্য পরিষ্কার, উদ্দেশ্য অর্জন করার প্রক্রিয়ায় দৃঢ়, ঐক্য লোহার মত, দুর্বলতা শুধু এই জায়গায়- সংখ্যাল্পতায়। তাই এর জবাবে তারা যখন শুনলেন যে, সেই একমাত্র দুর্বলতাই থাকবে না, সংখ্যায় ঐ উম্মাহ হবে অগণিত, তখন পরাজয় কি কোরে সম্ভব? বিশেষ কোরে যখন ঐ ছোট্ট উম্মাহ তাদের চেয়ে সংখ্যায় বহু বেশি, সুসজ্জিত, সুশিক্ষিত শত্রুদের বারবার পরাজিত কোরেছেন। তারা আবার মহানবীকে প্রশ্ন কোরলেন- আমরা সংখ্যায় অসংখ্য হোলে পরাজিয় কি কোরে সম্ভব? রসুল জবাব দিলেন, একটা উপমা দিয়ে, বোললেন- মনে করো লক্ষ লক্ষ উট, কিন্তু উটগুলো এমন যে যেটার উপরই চড়ে বোসতে যাও ওটাই বসে পড়ে বা পড়ে যায়। ঐ অসংখ্যের মধ্যে এখানে ওখানে কিছু উট পাওয়া যাবে যেগুলোর পিঠে চড়া যাবে। বিশ্বনবীর উপমাটা লক্ষ্য কোরুন- উট। উটের উদ্দেশ্য কি? উট দিয়ে কি কাজ হয়? উট হোচ্ছে বাহন, মানুষকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেইটাই যদি উট দিয়ে না হয় তবে ঐ উট অর্থহীন- দেখতে অতি সুন্দর উট হোলেও এবং সংখ্যায় অসংখ্য হোলেও। শেষনবীর সেই ভবিষ্যদ্বাণী বহু আগেই পূর্ণ হোয়েছে, সংখ্যায় অসংখ্য হওয়া সত্ত্বেও শত্রুর পদানত দাস হোয়েছে, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হোয়েছে এবং হোচ্ছে। মহানবীর বর্ণনা অনুযায়ী এরা দেখতে অতি সুন্দর উট, লম্বা কোর্তা, পাগড়ী, লম্বা দাড়ি, ছেটে ফেলা মোচ, টাখনুর ওপরে ওঠা পাজামা, কাঁধে চেক রুমাল, দিনে পাঁচবার মসজিদে দৌড়াচ্ছেন, গোল হোয়ে বোসে চারিদিক প্রকম্পিত কোরে আল্লাহর যিকর কোরছেন, খানকায় বোসে মোরাকাবা, কাশফ কোরছেন- দেখতে একেবারে নিখুঁত উট। কিন্তু আসলে উট নয়, ওদের পিঠে চড়া যায় না, চড়লেই বসে পড়ে।

কারণ কি? কারণ ফতওয়াবাজরা এবং ভারসাম্যহীন সুফীরা জাতির বহির্মুখী আকিদাকে উলটিয়ে অন্তর্মুখী কোরে দিয়েছেন, দুর্বার সংগ্রামের জন্য যে জাতিটিকে আল্লাহ আর তাঁর রসুল সৃষ্টি কোরেছিলেন সেটার অন্তরাত্মাকে ফতওয়াবাজরা এবং সুফীরা নির্জনবাসী, উদাসী, বৈরাগীতে পরিণত কোরে দিয়েছেন, কাপুরুষে পরিণত কোরেছেন। যে উদ্দেশ্যে এ জাতি সৃষ্টি করা হোয়েছিলো তাই-ই নাই, কাজেই এই জাতিও এখন অর্থহীন। প্রমাণ চান? শরাহ-শরিয়তের অত্যন্ত পাবন্দ, পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে যেয়ে নামাজী, লম্বা দাড়ি, মোছ মোড়ানো, টুপি-পাগড়ী মাথায়, হাতে সর্বদা তসবিহ অর্থাৎ মুত্তাকী একজনকে যেয়ে বলুন যে- দেশে মানুষের অপরাধ বেড়ে যাচ্ছে, এসলাম বিরোধীরা এই দীনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সক্রিয় হোয়ে উঠেছে, শুধু তাই নয়, তারা এমন কি কাগজে পত্রে আল্লাহ, রসুল ও দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রুপ কোরে অপমান কোরে লিখে, প্রকাশ কোরছে, চোলুন আমরা একতাবদ্ধ হোয়ে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াই, এগুলিকে প্রতিহত করি। আপনার এ ডাক শুনে খুব সম্ভব ঐ অতি মোসলেম মোত্তাকী পরহেজগার আপনার মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থেকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবেন। অন্তত শতকরা পঁচানব্বই জনই যাবেন। আপনি কি কোরছিলেন জানেন? আপনি রসুলাল্লাহ বর্ণিত ঐ অসংখ্য উটের একটায় চড়তে গিয়েছিলেন। ঐ উটগুলির নামাজ, রোজা, তসবিহ, ডান পা দিয়ে মসজিদে ঢোকা কিছুই গৃহীত হবে না, সমস্ত আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। এরা এবং যারা মানুষের অর্থাৎ গায়রুল্লাহর তৈরি আইন-কানুন, দণ্ডবিধি অর্থাৎ জীবন ব্যবস্থায় বাস কোরেও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে না তাদের সম্বন্ধে বিশ্বনবী বোলেছেন তাদের রোজা হোচ্ছে না খেয়ে থাকা আর তাহাজ্জুদ হোচ্ছে ঘুম নষ্ট করা।

কার্ল মার্কস ধর্মকে আফিম বোলেছেন। তাকে একদিক দিয়ে দোষ দেই না। তিনি 'ধর্ম' বোলতে যা দেখিয়েছেন তা অবশ্যই আফিম। তিনি দেখেছিলেন তার নিজের দেশে খ্রিস্টান ধর্ম যেটার অবস্থা পেছনে বর্ণনা কোরে এসেছি। মানুষের জাতীয় জীবনের ব্যর্থতার কারণে ব্যক্তিজীবনে নির্বাসনের পর ওটা যাজক ও সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণির হাতে শোষণের হাতিয়ার হোয়ে দাঁড়িয়েছিলো। হিন্দু-বৌদ্ধ ইত্যাদি "ধর্ম"কে দেখেছিলেন- ঐ একই অবস্থা প্রায়। তাদের মধ্যে যারা ধার্মিক তারা সংসার ত্যাগ কোরে হয় বনবাসে গেছেন, না হয় মন্দিরে, মঠে, প্যাগোডায় ঢুকেছেন- সমাজকে ছেড়ে গেছেন শোষক অত্যাচারীদের হাতে। ব্যতিক্রম তিনি দেখতে পেতেন এই শেষ 'ধর্মে'র

দিকে চাইলে। কিন্তু তা পারলেন না, কারণ মার্কস যখন চিন্তা কোরছেন অর্থাৎ গত ঊনিশ শতাব্দী (খ্রিস্টীয়) ততদিনে সামান্য কিছু লোকের মধ্যে ছাড়া, মোহাম্মদের (দ:) প্রবর্তিত 'ধর্ম' পৃথিবীতে নেই। মার্কস দেখলেন অন্যান্য আর দশটা 'ধর্মে'র মতই আরেকটি সেই অন্তর্মুখী 'ধর্ম' যার অনুসারীরা ইউরোপিয়ানদের জুতার তলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে, 'ধর্মে'র বিধান নিয়ে নিজেদের মধ্যে দলাদলি কোরছে, হাতে তসবিহ নিয়ে মসজিদে দৌড়াচ্ছে, খানকায় বোসে পীর-মুরিদী কোরছে- সমাজের হর্তাকর্তারা শোষক, অন্যায়কারী। কাজেই মার্কস পৃথিবীর দিকে চেয়ে যে 'ধর্ম'গুলি তখন দেখলেন সেগুলোকে তিনি যে আফিম আখ্যা দিয়েছিলেন সে জন্য তাকে কিছুমাত্র দোষ দেই না, তিনি একেবারে সত্য কথা বোলেছিলেন। মার্কসের প্রতি আমার অভিযোগ এই যে, তিনি শেষ এসলামটাকে আর তার ইতিহাসটাকে ভালো কোরে পড়ে দেখলেন না, পড়লে মার্কস যদি অকপট হৃদয়ে মানব সমাজের শুধু অর্থনৈতিক নয় সব রকমের শোষণ, অন্যায়, অত্যাচার নির্মূল কোরতে চেয়ে থাকতেন তবে তাকে সমাজতন্ত্র আবিষ্কার কোরতে হতো না। সমাজতন্ত্র আবিষ্কার কোরে তিনি তো মানব জীবনের একটি মাত্র অঙ্গনে (Facet), অর্থনৈতিক অঙ্গনের, সমাধান বের কোরলেন। কিন্তু মানুষের জীবন কী শুধু অর্থনৈতিক সমস্যাতেই পূর্ণ? নিশ্চয় নয়, অনেক কিছু নিয়েই মানুষ। **মার্কসের সমাধান হলো মানুষের জীবনের শুধু একটি অঙ্গনের ভারসাম্যহীন সমাধান**। এ সমাধান পূর্ণ সমাধান নয়, তাই ইতোমধ্যেই কার্যতঃ সমাজতন্ত্রের কবর হোয়ে গেছে, যতটুকু টিকে আছে সেটা পুরাতন নেতাদের নামের উপর ভর কোরে, জেনারেশন গ্যাপ হোলে স্বাভাবিক নিয়মে সেটাও তিরোহিত হোয়ে যাবে। ১৯৯০-তে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা সুস্পষ্ট হোয়ে যাওয়ায় মার্কসবাদীদের তীর্থভূমি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়, তারপরই সারা দুনিয়ায় সমাজতন্ত্র নিক্ষিপ্ত হয় আঁস্তাকুড়ে। সে সময়ের গোঁড়া সমাজতান্ত্রিকরা আজও দুর্বল কণ্ঠে সমাজতন্ত্রের জয়গান করেন কিন্তু বাস্তবে তারা সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা মার্কস লেলিনের আদর্শকে বিসর্জন দিয়েছেন এবং বর্তমানে তারা চরম পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অনুসারী। মার্কস শেষ জীবন ব্যবস্থাটিকে খোলা মন নিয়ে পর্যবেক্ষণ কোরলে দেখতে পেতেন যে, মানুষের জীবনের প্রতি অঙ্গনের সমস্যার সমাধান এতে দেয়া আছে, শুধু অর্থনৈতিক নয়। আর সেটা মানুষের সীমিত মগজের সমাধান নয়। যিনি মানুষকে সৃষ্টি কোরেছেন, শুধু মানুষকে নয় এই বিশাল সৃষ্টি কোরেছেন, তাঁর দেয়া সমাধান। সমাধান দিয়ে তিনি বোলছেন- যিনি তোমাদের সৃষ্টি কোরেছেন তোমরা কি তাঁর চেয়ে বেশী জানো? তারপর নিজেই এ প্রশ্নে জবাব দিচ্ছেন- তিনি সমস্ত কিছুই জানেন (কোর'আন- সুরা মুলক ১৪, সুরা আল হজ্ব ৬৩)। মার্কসের কাছে এ যুক্তির খণ্ডন আছে? মার্কস যদি এই জাতির ইতিহাস পড়তেন তবে দেখতেন **বিশ্বনবী যে জীবনব্যবস্থা শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা পরমাণু বোমের মত ফেটে অর্ধেক পৃথিবীকে আচ্ছন্ন কোরে ফেলেছিলো। আফিম অমন কোরে ফাটেনা, আফিম নিঃশব্দে বুঁদ কোরে দেয়, যেমন কোরে ফতোয়ার বিশ্লেষণ আর বিকৃত তাসাওয়াফের আফিম বিশ্বনবীর তৈরি এই মহাশক্তিশালী বোমাটিকে বুঁদ কোরে নিষ্ক্রিয় কোরে দিয়েছে,** আর তাই মার্কস অন্যান্য 'ধর্মে'র সাথে সাথে একেও আফিম বোলতে পারছেন, আর দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা প্রতিবাদও কোরতে পারছি না। এই ভারসাম্যহীন সূফীবাদের প্রভাবে এই জাতির আকিদা, দৃষ্টিভঙ্গী (Concept) এমনভাবে আজ বিকৃত যে, গহ্বরে ঢুকে প্রাণপণে তসবিহ জঁপা আর খুঁটিনাটি নিয়ম পালন করাকেই আজ সম্পূর্ণ 'ধর্মকর্ম' করা মনে হোচ্ছে। এ দীনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থাৎ আল্লাহ এবলিসের যে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কোরে তার দীনকে পৃথিবীতে চালু কোরে শান্তি প্রতিষ্ঠা, তা আজ এই মহা দীনদারদের মন-মগজ থেকে বহু দূরে। তাবুকের অভিযানে, যেখানে কোন যুদ্ধই হলো না, প্রচণ্ড গরমের ভয়ে কয়েকজন আসহাব (রা:) যোগ দেন নি বোলে তাদের শাস্তি দেয়া হলো, তাদের কয়েক মাসের জন্য একঘরে (Boycott) কোরে দিয়ে এবং এ শাস্তি মহানবী দেন নি, দিয়েছিলেন স্বয়ং আল্লাহ। আর আজ যদি আল্লাহর রসুল পৃথিবীতে ফিরে এসে এ জাতিকে ডেকে বলেন- "হে আমার জাতি! আল্লাহ আমার উপর এই দীন এ এসলামকে সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠার যে ভার দিয়েছিলেন তা আমি আরম্ভ কোরে তোমাদের হাতে ছেড়ে গিয়েছিলাম পূর্ণ করার জন্য। তোমরা তো সেটা বহু আগেই ছেড়ে দিয়েছো, আমার সুন্নাহ ত্যাগ করেছো। এখন তোমাদের প্রথম কেবলা শত্রুর হাতে। ফিলিপাইনে, ইথিওপিয়ায়, সুদানে, ভারতে, বসনিয়ায় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শত্রুরা তোমাদের ভাইদের হত্যা কোরতে কোরতে শেষ কোরে দিচ্ছে আর তোমরা এখনও ঘরে বোসে তসবিহ পড়ছো? ওঠো! সব ত্যাগ কোরে এই অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হোয়ে আমার উম্মাহর জন্য আল্লাহ যে সংগ্রাম ফরদ কোরে দিয়েছেন, সেটা আরম্ভ কর।" তাহোলে কী হবে? এ জাতির 'ধর্মীয়' নেতারা তখন হুজরা আর খানকা শরীফ থেকে মাথা বের কোরে বোলবেন- "ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা জেহাদে আকবর নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি। আপনিই তো বোলেছেন নফসের সাথে জেহাদই হোচ্ছে জেহাদে আকবর। অস্ত্র হাতে নিয়ে ছোট জেহাদ আমরা করিনা, ও জেহাদ আপনিই জীবনভর কোরে এসেছেন, এখনও আপনিই করেন গিয়ে।" নিঃসন্দেহে বলা যায়- যেরুযালেম

> কার্ল মার্কস ধর্মকে আফিম বোলেছেন। তাকে একদিক দিয়ে দোষ দেই না। তিনি 'ধর্ম' বোলতে যা দেখিয়েছেন তা অবশ্যই আফিম। তিনি দেখেছিলেন তার নিজের দেশে খ্রিস্টান ধর্ম যেটার অবস্থা পেছনে বর্ণনা কোরে এসেছি। মানুষের জাতীয় জীবনের ব্যর্থতার কারণে ব্যক্তি জীবনে নির্বাসনের পর ওটা যাজক ও সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণির হাতে শোষণের হাতিয়ার হোয়ে দাঁড়িয়েছিলো। হিন্দু-বৌদ্ধ ইত্যাদি "ধর্ম"কে দেখেছিলেন- ঐ একই অবস্থা প্রায়। তাদের মধ্যে যারা ধার্মিক তারা সংসার ত্যাগ কোরে হয় বনবাসে গেছেন, না হয় মন্দিরে, মঠে, প্যাগোডায় ঢুকেছেন- সমাজকে ছেড়ে গেছেন শোষক অত্যাচারীদের হাতে। ব্যতিক্রম তিনি দেখতে পেতেন এই শেষ 'ধর্মে'র দিকে চাইলে।

বায়তুল মোকাদ্দসের মত মক্কা এবং কাবা আজ যদি শত্রুর হাতে চলে যায় তাহোলেও ঐ জেহাদে আকবরের জেহাদিরা ঐ শত্রু অধিকৃত কাবার দিকে মুখ কোরেই ফরদ, নফল নামাজ পড়তে থাকবেন, তাহাজ্জুদ পড়তে থাকবেন, আর এই 'উম্মতে মোহাম্মদী' তার দৈনন্দিন কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য চাকরি কোরতে থাকবে, আজ বায়তুল মোকাদ্দস হারাবার পরও যেমন কোরছে। একথা বোঝার শক্তিও এ হতভাগ্য জাতি হারিয়ে ফেলেছে যে, তাদের ঐ অতি নিষ্ঠার সমস্ত এবাদত আল্লাহ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান কোরছেন। একপেশে, ভারসাম্যহীন তাসাওয়াফ জাতির আকিদা, এসলামের প্রকৃত আকিদার ঠিক উল্টো আকিদা শিক্ষা দিয়ে একে কোথায় নিয়ে এসেছে। এখানে একটি কথা বোলে নেই, এই দীনের তথাকথিত আলেম শ্রেণির সামনে জেহাদের প্রসঙ্গ উঠলেই তারা সমস্বরে বোলে ওঠেন, 'আল্লাহর রসুল বোলেছেন, আসল জেহাদ হোল আত্মার কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে, নফসের বিরুদ্ধে, এটাই হোচ্ছে জেহাদের আকবর বা সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ। আর অস্ত্র হাতে যুদ্ধ, ওটা হোল জেহাদে আসগর, মানে ছোট জেহাদ।' এই কথাগুলি তারা রসুলাল্লাহর নামে চালিয়ে দেন অথচ এগুলি কোন হাদিস নয়। এই হাদিসের সংকলক এমাম বায়হাকি নিজেই স্বীকার কোরেছেন যে, এই হাদিসের সনদ ত্রুটিযুক্ত এবং এই দয়িফ হাদিস সম্বন্ধে হাফেয ইবনে হাজ্জার প্রমুখ মোহাদ্দেসরা বোলেছেন, এটা কোন হাদিসই না, এটা একটা আরবি প্রবাদ বাক্য মাত্র। তার চেয়েও বড় কথা হোচ্ছে কোন হাদিস সহীহ্ কি না তা যাচাই করার প্রথম কষ্টিপাথর হোচ্ছে কোর'আন। সেই কোর'আনেই আল্লাহ স্বয়ং আমাদের বোলে দিচ্ছেন বড় জেহাদ অর্থাৎ জেহাদে আকবর বা কবীর কোন্‌টা। সুরা ফোরকানের ৫২ নং আয়াতে তিনি বোলেছেন, "সুতরাং কাফেরদের কথামত চলো না এবং এর (কোর'আনের) সাহায্যে তাদের সঙ্গে বড় জেহাদ কর। জেহাদান কবীর কর।" অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদই হোচ্ছে জেহাদে আকবর, নফসের সঙ্গে নয়। রসুলাল্লাহর দুনিয়া থেকে বিদায়ের ৬০/৭০ বছর পরে এই জাতির পথভ্রষ্ট লোকেরা যখন নীতি হিসাবে জেহাদ ত্যাগ কোরলেন তখন এই জাতির আলেমরা তাদের ঐ কাজের ন্যায্যতা প্রমাণের চেষ্টায় হাদিস উদ্ভাবন কোরলেন যে নফসের সঙ্গে জেহাদই হোচ্ছে জেহাদে আকবর, বড় জেহাদ যা পবিত্র কোর'আনের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

এখানেই এই বিকৃতির শেষ নয়। পেছনে বোলে এসেছি যে, এই ভারসাম্যহীন তাসাওয়াফ শুধু মাত্র একটি প্রক্রিয়া। আত্মার ধোয়ামোছা, ঘষামাজা কোরে আত্মার শক্তি বৃদ্ধি করা। এ প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল সুতরাং এর নানা রকম পথ (তরিকা) আছে। আত্মার মার্জনা ও পরিষ্কারের প্রক্রিয়া অন্যান্য সব ধর্মেও আছে এবং ঐ সব ধর্মেও বহু বিভিন্ন প্রক্রিয়া (তরিকা) আছে। উদ্দেশ্য একই অর্থাৎ আত্মার শক্তিবৃদ্ধি সুতরাং সবার প্রক্রিয়ার মধ্যে মিলও আছে। এ কারণেই 'মোসলেম' সুফীদের ও অন্যান্য ধর্মের আধ্যাত্মিক সাধকদের মধ্যে বিশেষ কোন বিরোধ নেই। এমনকি কিছুটা উর্ধ্বে উঠে যাওয়ার পর অনেক সাধকদের বোঝা মুশকিল তারা আসলে কোন ধর্মের। এই জন্য একাধিক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সুফীদের মৃত্যুর পর দুই তিন ধর্মের লোকদের মধ্যে তাদের লাশ নিয়ে টানাটানি হোয়েছে। কথাটা বোধ হয় পরিষ্কার কোরে বোঝাতে পারলাম না। এই শেষ এসলামের যে ভারসাম্যটার কথা আগে বোলে এসেছি সেটার কথা হোচ্ছে। এক দিকে জাতীয় শরিয়াহ অন্যদিকে ব্যক্তিগত শরিয়াহ ও আত্মা এবং এ দুটোর ভারসাম্য। পূর্ববর্তী সমস্ত দীনেরও ঐ ভারসাম্য ছিলো কিন্তু এই শেষ এসলামে একটা ব্যতিক্রম এলো। এই ব্যতিক্রমটা হলো এই যে, জাতীয় শরিয়াহ এর আগের দীনগুলিতে ছিলো সীমিত, সমস্ত পৃথিবীর জন্য নয়, সমস্ত মানবজাতির জন্য নয়। কিন্তু শেষটা এলো সমস্ত পৃথিবীর জন্য, যাকে বলে সার্বজনীন। শুধু তাই নয়, এলো পৃথিবীর ও মানব জাতির বাকি আয়ুষ্কালের জন্য। কাজেই এর মধ্যে এমন কোন আইন-কানুন, নিয়ম আল্লাহ দিলেন না যা পৃথিবীর এক জায়গার জন্য ঠিক অন্য জায়গার জন্য বেঠিক, পালন করা মুশকিল বা অচল। এমনও দিলেন না যা আজ ঠিক আগামীতে কঠিন বা অচল, এক কথায় স্থান বা কালের প্রভাবাধীন নয়। সুতরাং পূর্ববর্তী দীনগুলো থেকে এই শেষ দীনের জাতীয় দিকটার আইন-কানুন বেশ কিছু তফাৎ হোতে বাধ্য হলো। কিন্তু ভারসাম্যের যে অন্য পার্শ্বটা অর্থাৎ আত্মার দিকটা, ওটাতে তফাৎ বিশেষ কিছু হলো না, কারণ আত্মার উন্নতির প্রক্রিয়ায় বড় কোন অমিল নেই পূর্ববর্তী দীনগুলোর সাথে, কারণ সব ধর্মের প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্বয়ং আল্লাহর আত্মা (রুহ) অবস্থান কোরছে। ভারসাম্যহীন সুফীরা যখন জাতীয় শরিয়াহকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন কোরে আত্মার উন্নতির প্রক্রিয়ায় লেগে গেলেন তখন দেখলেন যে, ঐ ব্যাপারে পূববর্তী দীনগুলির আত্মার উন্নতির প্রক্রিয়ার সাথে যথেষ্ট মিল আছে। যে জীবন-বিধান অর্থাৎ শরিয়াহকে সংগ্রাম কোরে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার আদেশ স্রষ্টা দিলেন, পূর্ববর্তী দীনগুলির শরিয়াহগুলির সঙ্গে এর বৈশিষ্ট্য বেশ প্রকট, কিন্তু অপর পার্শ্বের অর্থাৎ আত্মার দিকটাতে মিল আছে। সুফীরা শুধু ঐ দিকটাকে আঁকড়ে ধোরে দেখলেন অন্যান্য ধর্মের, দীনের ঐ দিকটায় সংঘর্ষের বিশেষ ক্ষেত্র নেই। অন্যান্য দীনের পূর্ববর্তী ধর্মগুলির আধ্যাত্মিক সাধকদের সাথে সুফীদের কোন সংঘর্ষ তো হলোই না, বরং বহু সুফী দুই দীনের মাঝামাঝি স্থান যাকে বলা যায় (Twilight Zone) খুঁজে নিলেন। অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে এটাও না ওটাও না, এর কিছু প্রক্রিয়া ওর কিছু প্রক্রিয়া। এর অসংখ্য উদাহরণ দিতে পারি- সবচেয়ে ভালো উদাহরণ বোধহয় শিখ 'ধর্মের' প্রবর্তক গুরু নানক। যতদূর জানা যায় ইনি মোসলেম সাধক ছিলেন, সুফী ছিলেন, একাধিকবার হজ্ব কোরেছিলেন। সাধনার উচ্চ স্তরে উঠে তিনি দেখলেন হিন্দু ধর্মেও আত্মার উন্নতির ভালো প্রক্রিয়া আছে।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দু বোলে কোন ধর্ম নেই, উপমহাদেশে অনেক নবীর (আ:) আগমন হোয়েছে, তাদের দীনগুলির বিকৃত রূপ আজও সমস্ত উপমহাদেশময় ছড়িয়ে রোয়েছে, প্রত্যেকটি গোড়ায় সেই তওহীদ, দীনুল কাইয়্যেমা, সনাতন ধর্ম। ভারতে নবী-রসুলদের আগমনের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। বলা চলে হাজার বছর তো বটেই, এমন কি লক্ষ বছরও হোতে পারে। সুতরাং এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এই এলাকায় আগত নবী-রসুলদের প্রকৃত শিক্ষাকে বিকৃত করা হোয়েছে। ভাষাগত তারতম্যের কারণে এবং সময়ের ব্যবধানে এই নবীদের অনেকের নাম পর্যন্ত পরিবর্তিত হোয়ে গেছে, তারা এখন অন্য নামে পরিচিত হোচ্ছেন। যেমন ঈসা (আ:) এর আগমন মাত্র দুই হাজার বছর আগে। কেউ তাকে ডাকেন যিশু, কেউ যশুয়া, কেউ ঈসা আবার কেউ জেসাস। এভাবে তার শিক্ষাকেও বিকৃত কোরে খ্রিস্ট ধর্মের রূপ দেওয়া হোয়েছে; যদিও আল্লাহ খ্রিস্টান ধর্ম বোলে আলাদা কোন ধর্ম পাঠান নি। অন্যান্য নবী-রসুলদেরকে আল্লাহ যে সর্বব্যাপী তওহীদ দিয়ে পাঠিয়েছেন, ঈসা (আ:) কেও সেই তওহীদ, সেই সার্বভৌমত্ব, দীনুল কাইয়্যেমা, সনাতন ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর অনুসারীরা ছিলেন মো'মেন এবং

মোসলেম। পবিত্র কোর'আন নাযেল না হোলে মানুষ আজও ঈসা (আ:) সম্পর্কে প্রকৃত সত্য জানতে পারতো না, ঐ বিকৃতটাই জানতো। ঠিক তেমনি হিন্দুদের পুরাণে, বেদে, সংহিতায়, রামায়নে ও মহাভারতে যে ইতিহাস আমরা পাই সেখানেও রোয়েছে প্রচুর বিকৃতি। সেই সব বিকৃতির মধ্যেই মিশে আছে কিছু মহাসত্য যা দেখার মত দৃষ্টিশক্তি এই বিকৃত এসলামের আলেমদের নেই। থাকলে তারা দেখতে পেতেন যে, ঐ সব ধর্মগ্রন্থে যে সব অবতারদের কথা বলা হোয়েছে তাদের অনেকেই আল্লাহর প্রেরিত নবী, এবং যে ধর্মগ্রন্থগুলির চর্চা হিন্দু ধর্মে হোয়ে থাকে সেগুলির কিছু কিছু আল্লাহরই পাঠানো কেতাব। আরও দেখতে পেতেন যে, জেসাস যেমন ঈসারই (আ:) উচ্চারণ ভেদ বা নামান্তর, তেমনি মনু নুহের (আ:) নামান্তর, যুধিষ্ঠির ইদ্রীস (আ:) এর নামান্তর।

পবিত্র কোর'আন নাযেল না হোলে মানুষ আজও ঈসা (আ:) সম্পর্কে প্রকৃত সত্য জানতে পারতো না, ঐ বিকৃতটাই জানতো। ঠিক তেমনি হিন্দুদের পুরাণে, বেদে, সংহিতায়, রামায়নে ও মহাভারতে যে ইতিহাস আমরা পাই সেখানেও রোয়েছে প্রচুর বিকৃতি। সেই সব বিকৃতির মধ্যেই মিশে আছে কিছু মহাসত্য যা দেখার মত দৃষ্টিশক্তি এই বিকৃত এসলামের আলেমদের নেই। থাকলে তারা দেখতে পেতেন যে, ঐ সব ধর্মগ্রন্থে যে সব অবতারদের কথা বলা হোয়েছে তাদের অনেকেই আল্লাহর প্রেরিত নবী, এবং যে ধর্মগ্রন্থগুলির চর্চা হিন্দু ধর্মে হোয়ে থাকে সেগুলির কিছু কিছু আল্লাহরই পাঠানো কেতাব। আরও দেখতে পেতেন যে, জেসাস যেমন ঈসারই (আ:) উচ্চারণ ভেদ বা নামান্তর, তেমনি মনু নুহের (আ:) নামান্তর, যুধিষ্ঠির ইদ্রীস (আ:) এর নামান্তর।

যাহোক, এই হিন্দু ধর্মেও আত্মার উন্নতির ভালো প্রক্রিয়া রোয়েছে। গুরু নানক আধ্যাত্মিক উন্নতির কিছু প্রক্রিয়া সেখান থেকেও নিলেন, নিয়ে মিশ্রণ কোরে এক তরিকা প্রবর্তন কোরলেন, যে তরিকায় মোসলেম, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ সব দীন থেকেই লোক যোগ দিলো ঘষামাজা কোরে আত্মার শক্তি বৃদ্ধি কোরতে। এই তরিকা কালে একটি নতুন ধর্মেরই রূপ নিলো যেটা আজ শিখ ধর্ম; যেমন ইহুদি ধর্মের সংস্কারে ঈসার (আ:) প্রচেষ্টাকালে একটি নতুন ধর্মের, খ্রিস্ট ধর্মের রূপ নিয়েছিলো। বর্তমান 'এসলাম ধর্মের' তরিকাগুলি আলহাজ্জ সুফী নানকের তরিকার মত সাফল্য লাভ কোরতে পারে নি তাই শিখ ধর্মের মত আলাদা রূপ নিতে পারে নি কিন্তু একই রাস্তায় আছে। এক তরিকার অনুসারীরা অন্য তরিকার লোকদের থেকে নিজেদের আলাদা মনে করেন, এক পীরের মুরীদরা অন্য পীরের মুরীদদের পথভ্রষ্ট মনে করেন। এরই পরবর্তী পদক্ষেপ হোচ্ছে অন্য ধর্ম সৃষ্টি যা নানক সাফল্যজনকভাবে কোরেছেন। নানকের শিষ্য অর্থাৎ মুরীদদের মধ্যে কিছু বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান থাকলেও প্রধানতঃ প্রায় সম্পূর্ণটাই ছিলো হিন্দু ও মোসলেম। **অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির, শিখদের কেবলার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কোরেছিলেন আরেক মোসলেম সুফী সাধক- মিয়া মীর।** অদৃষ্টের বিদ্রূপ- পরবর্তীকালে ভারত ভেঙ্গে দুই রাষ্ট্র হবার সময় এই শিখরা হিন্দুদের পক্ষ হোয়ে লক্ষ লক্ষ মোসলেম হত্যা করেছে, আর বর্তমানে যেখানে পারছে হিন্দু হত্যা কোরছে।

এই দীনের যে তাসাওয়াফ আছে তা ভারসাম্যপূর্ণ, এর জাতীয় জীবনের শরীয়াহর সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ। এসলামের প্রকৃত তাসাউফ হোচ্ছে যখনই কোন কাজ করা হবে তখন মনে রাখতে হবে এই কাজটি আল্লাহর অনুমোদিত কিনা, যদি আল্লাহ ও রসুলের অনুমোদিত হোয়ে থাকে তাহোলে সেটা করা আর যদি আল্লাহ রসুলের নিষিদ্ধ হোয়ে থাকে সেটা না করা। অর্থাৎ কাজটি করা অথবা না করা এবং সেটা হবে আল্লাহর আদেশ বা নিষেধ মোতাবেক। হুকুম দেয়ার একমাত্র অধিকারী আল্লাহ কারণ সার্বভৌমত্ব হলো আল্লাহর। রসুলের কথা বলার কারণ রসুল আল্লাহর হুকুমের বাহিরে হুকুম দিতে পারেন না (সুরা হাক্কা- ৪৬, সুরা নজম ৩-৪)। আল্লাহর হুকুমের কোনটার কি মানে সেটা হলো রসুলের জীবনীতে অর্থাৎ রসুলের কথায়। সুতরাং এসলামের আধ্যাত্মিকতার শুরু হলো এখান থেকে। এটা কোরতে কোরতে কে কত উচ্চে উঠতে পারে, নিখুঁত (Perfect) হোতে পারে সেটা যার যার আমল। এটাকেই আল্লাহ বোলেছেন আমার যেকর, সকাল সন্ধ্যা তাঁর যেকর এ রত থাকা (সুরা আল আহযাব-৪১, ৪২)। অন্যভাবে বলা যায় তাকওয়া। জান্নাতে স্তর নির্ধারিত হবে এই তাকওয়া বা যেকরের উপর নির্ভর করে। বর্তমানে আধ্যাত্মিকতার নামে যে সুফিবাদ চালু আছে সেটা আল্লাহ ও রসুলের নয়। মো'মেনদের মধ্যে যিনি আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে যত সচেতন, যত বেশি মোত্তাকী তিনি তত বড় আধ্যাত্মিক সাধক। গাছের নিচে, ঝোপ ঝাড়ে বোসে, গুহায়, খানকায় বোসে অধ্যাত্ম অর্জন শেষ এসলামের অধ্যাত্ম নয়। আধ্যাত্মিক সাধকদের মূল উদ্দেশ্য হোচ্ছে ষড় রিপুকে দমন কোরে আত্মার উন্নতি সাধন। এখানে ষড়রিপু সম্পর্কে দুইটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। প্রথম ধোরুন 'লোভ'। লোভ হোল মানুষের ষড়রিপুর একটি রিপু। লোভ মানুষকে হীন পশুতে পরিণত কোরে দিতে পারে। একজন সাধক চোখ বন্ধ কোরে, না খেয়ে, আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ (Control) কোরতে পারে, যেমন হয়তো সে ৫০ বছরে কেবল লোভ থেকে মুক্ত হোল (যদিও আদৌ ১০০% সম্ভব কিনা তা যথেষ্ট সন্দেহ রোয়েছে)। অন্যদিকে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের ডাক যখন আসে একজন মো'মেন মোজাহেদ সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়ি, ঘর, সহায় সম্পত্তি, আত্মীয় পরিজন, বাবা-মা, স্ত্রী, সন্তান সব কিছুর মায়া ত্যাগ কোরে জেহাদে অংশগ্রহণ করে, অতঃপর সেখানে অবশেষে নিজের জানটুকু পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় কোরবান কোরে শহীদ হোয়ে যায়। তাহোলে লোভ থেকে, মোহ থেকে, ক্রোধ থেকে, ভোগের বাসনা থেকে ১০০% কে মুক্ত হোয়ে গেলো, কামেলিয়াত অর্জন কোরল, নিশ্চয় ঐ মোজাহেদ। একজন মোজাহেদ জেহাদ করে প্রথমত মানবজাতির কল্যাণের জন্য, আল্লাহকে বিজয়ী করার জন্য, পক্ষান্তরে সাধু, ফকির, দরবেশ জুহুদ বা আত্মিক সাধনা করে একান্তই নিজের জন্য, স্বীয় আত্মিক পরিতৃপ্তি ও পরিশুদ্ধির জন্য। প্রশ্ন হোল বছরের পর বছর ধোরে যে সাধক জুহুদ কোরে অর্থাৎ সাধনা কোরে একটা একটা কোরে রিপু জয় কোরতে চেষ্টা কোরল কিন্তু কোনটা

থেকেই হয়তো পুরোপুরি মুক্ত হোতে পারলো না সেখানে একজন মোজাহেদ কিভাবে সমস্ত কিছু বিসর্জন দেওয়ার মাধ্যমে একসঙ্গে সকল ষড়রিপু থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হোয়ে সর্বোচ্চ কামেলিয়াত হাসিল কোরল। এর সহজ উত্তর, এটা মহান আল্লাহ কোরে দিয়েছেন কারণ সে আল্লাহকে বিজয়ী করার জন্য আত্মনিয়োগ কোরেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই সুন্দর পৃথিবী আল্লাহ সৃষ্টি কোরেছেন বনী আদমের জন্য, বনী আদম আল্লাহর খেলাফত কোরবে, এখানে তারা শান্তিতে থাকবে, দুনিয়ার আলো-বাতাস, খাদ্য-পানীয় ইত্যাদি ভোগ কোরবে, বংশ বৃদ্ধি কোরবে, দুনিয়া চাষাবাদ কোরবে এটাই হলো স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষ যদি কাম প্রবৃত্তি দমন কোরতে থাকে, পাহাড়ে-জঙ্গলে বসে সংসার না কোরে জীবন অতিবাহিত করে তাহোলে মানবজাতি একসময় বিলুপ্ত হোয়ে যাবে। কয়েকটি প্রশ্ন এখানে প্রাসঙ্গিক:

ক) যদি নারী-পুরুষ বৈবাহিক জীবন যাপন না করে তাহোলে আল্লাহ নারীদের সৃষ্টি কোরলেন কেন?

খ) বনী আদমের বংশ বৃদ্ধি হবে কিভাবে, আল্লাহর খেলাফত কে কোরবে?

গ) সমস্ত মানবজাতির পক্ষে কি এসব তরিকা অবলম্বন করা সম্ভব? যদি সম্ভব না হয় তবে তা সার্বজনীন নয়। আর যা সার্বজনীন নয় তা এসলাম হোতে পারে না।

ঘ) তাছাড়া আল্লাহর রসুল (দ:) বোলেছেন, 'তোমাদের উপর তোমাদের নফসের হক রোয়েছে। নফল সওম রাখো এবং তা থেকে বিরত থাকো। রাতের বেলা তাহাজ্জুদের সালাহ কায়েম করো এবং ঘুমাও। আমি তাহাজ্জুদের সালাহ কায়েম কোরি এবং ঘুমাইও। কোন কোন সময় সওম রাখি। আবার কোন কোন সময় সওম ত্যাগও কোরি। গোশত খাই, চর্বিও খেয়ে থাকি। স্ত্রীদের নিকটও যাই। যে আমার সুন্নাহ ত্যাগ করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।' শরীরকে বঞ্চিত করাকে তিনি জুলুম বা অন্যায় বোলে আখ্যায়িত কোরেছেন।

সুতরাং এই কথা পরিষ্কার যে, এসলামের অধ্যাত্মবাদ হোল প্রত্যেক কাজে আল্লাহর উপস্থিতি গণ্য করা অর্থাৎ এটা মনে করা যে আমার এই কাজ আল্লাহ দেখছেন এবং আল্লাহর আদেশ নিষেধ অনুযায়ী সেই কাজ করা বা না করা। যে এটা যত বেশি স্মরণে রেখে জীবন অতিবাহিত কোরল সে তত বড় কামেল, তত বড় মোত্তাকী। আখেরী নবীর সাহাবীদের মধ্যে অর্থাৎ প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে এই তাসাউফই ছিলো। কিন্তু মোটামুটি খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে পারস্য থেকে যে একপেশে বিকৃত সুফীবাদ এসলামে প্রবেশ কোরে একে স্থবির কোরে দিলো, বিশ্বনবীর অপরাজেয়, দুর্ধর্ষ উম্মাহটাকে কাপুরুষ বানিয়ে দিলো সেটা এসলামের তাসাওয়াফ নয় এবং আজও ঐটাই 'মোসলেম' দুনিয়াময় জোরে সোরে চোলছে, ঐ প্রাণ হত্যাকারী তাসাওয়াফ প্রক্রিয়াকেই ভালো মোসলেম হবার উপায় হিসাবে বিবেচনা করা হোচ্ছে। কঠিন পরিশ্রম রেয়াযাত কোরে আত্মার শক্তি বৃদ্ধি করা হোচ্ছে। এ প্রক্রিয়া অন্যান্য ধর্মেও আছে এবং তারা সাধনা কোরে শক্তি লাভ করেন। তাদের কেরামত এই 'মোসলেম' সাধকদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এই সাধনা করার জন্য এই উম্মাহর সৃষ্টি করা হয় নি। একে সৃষ্টি করা হোয়েছে পূর্ববর্তী দীনগুলির বিকৃত অবস্থার আইন-কানুন ও মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা চুরমার কোরে এই শেষ এসলাম প্রতিষ্ঠা কোরে পৃথিবী থেকে সর্বরকম অবিচার, অন্যায়, শোষণ-যুলম নিশ্চিহ্ন কোরে শান্তি (এসলাম) স্থাপন করার জন্য। এই ব্যাপারে আল্লাহর সরাসরি ঘোষণা হোচ্ছে, আল্লাহ তাঁর রসুলকে পাঠিয়েছেন পথ-প্রদর্শন, হেদায়াহ ও সত্য দীন দিয়ে এই জন্য যে, তিনি পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য সমস্ত দীনগুলির উপর একে প্রতিষ্ঠা কোরবেন। তাঁর রসুলের জীবনের লক্ষ্য এত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বোলে দিয়েও সন্তুষ্ট না হোয়ে, এযে কত গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাবার জন্য বোললেন- (এই কথার) সাক্ষী হিসাবে স্বয়ং আল্লাহই যথেষ্ট (কোর'আন- সুরা আল ফাতাহ ২৮)। আল্লাহ সেই পরিষ্কার দিক-নির্দেশনা তাঁর নবী কি অমান্য কোরে অন্য কাজ কোরেছিলেন? অবশ্যই নয়, তাঁর কর্মবহুল বর্হিমুখী, সংঘর্ষমুখী জীবনই তাঁর প্রমাণ। সেই জীবনের বর্তমানে যে তাসাওয়াফ চলে তার নামগন্ধ নেই, খানকাহ বোলে কোন শব্দ রসুলাল্লাহ বা তার আসহাব কোনদিন শুনেনও নাই। তসবিহ কি জিনিস তারা জানতেন না (তসবিহ বহু পরে, অধ্যাত্মবাদের অনুপ্রবেশের পর খ্রিস্টানদের Rosary ও হিন্দুদের জপমালা থেকে নেয়া হোয়েছে)। ইতিহাস ও তার সিরাতসমূহ সাক্ষী যে তাঁর জীবন শুধু সংগ্রাম, সংগ্রাম আর সশস্ত্র সংগ্রাম। আর এই বিকৃত তাসাওয়াফে সংগ্রামের গন্ধও নেই। এই তাসাওয়াফ যে এসলামের নয় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হোচ্ছে এই যে, এই তাসাওয়াফ অনুশীলনকারীদের মধ্যে বহু লোক আছেন যারা বর্তমানে চালু পাশ্চাত্যের আইন ব্যবসায়ী, বহু আছেন যারা ব্যাংকের পরিচালক, ব্যাংকে কাজ কোরে ব্যাংকের সঙ্গে সুদ ভিত্তিক ব্যবসা করেন। এইসব লোকদের মধ্যে অনেক আছেন যারা রেয়াযত কোরে আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি কোরেছেন। তাদের কাশ্ফ হয়, অনেক গায়েবী খবর তারা জানতে পারেন, তাদের কেরামতের শক্তিও অর্জিত হোয়েছে। এখন প্রশ্ন - মানুষের তৈরি যে আইন ধ্বংস কোরে, যে শোষণমূলক, সুদভিত্তিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আল্লাহর আইন ও জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কোরতে আল্লাহ তাঁর শেষ নবীকে ও তাঁর উম্মাহকে নির্দেশ দিয়েছেন, সেইগুলিই যাদের পেশা, জীবিকা তারা কি কোরে ঐ উম্মাহভুক্ত হোতে পারেন? বিশেষ জটিল কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়ায় অন্যান্য ধর্মের লোকেরা সাধনা কোরে যেমন ঐসব শক্তি লাভ করেন, এরাও তাই কোরছেন। শেষ দীনের উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়ার সাথে এ সবের কোন মিল নেই- দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। ভূল বোললাম, আলাদা জিনিস নয়, বিপরীতগামী জিনিস- একটি বহির্মুখী ও বিস্ফোরক, অন্যটি অন্তর্মুখী স্থবির।

জানি না এ কথা সবার বোঝাবার মত কোরে লিখতে পারলাম কিনা যে এই দীনের, জীবন-ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য হোচ্ছে পৃথিবীতে সব রকম অন্যায়-অবিচার, শোষণ, অশান্তি, রক্তপাত বন্ধ কোরে শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠা করা। এইটাই হলো আল্লাহর প্রতি এবলিসের চ্যালেঞ্জ, যে চ্যালেঞ্জ আল্লাহ গ্রহণ কোরেছেন। ফেরেশতারা, মালায়েকরা বোলেছিলেন এই নতুন সৃষ্টি মানুষ পৃথিবীতে অশান্তি (ফাসাদ) ও রক্তপাত (সাফাকুদ্দিমা) কোরবে। ফাসাদ শব্দের অর্থের মধ্যে অশান্তি, অবিচার, শোষণ, অত্যাচার সব কিছুই আসে আর সাফাকুদ্দিমা শব্দের অর্থের মধ্যে খুন, যখম, যুদ্ধ ইত্যাদি সব কিছুই আসে। মালায়েকরা মানুষ সৃষ্টির বিরুদ্ধে এ যুক্তি আল্লাহর কাছে পেশ করেন নি যে মানুষ তোমার এবাদত কোরবে না, নামাজ, রোজা, হজ্ব কোরবে না, মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায়, সীনাগগে আর প্যাগোডায় যাবে না। আজ পৃথিবীময় মানুষ মসজিদে, মন্দিরে, সিনাগগে, প্যাগোডায় আর গীর্জায় শুধু ভিড় কোরছে তা নয়,

ওগুলোতে জায়গা পাওয়া মুশকিল। প্রতিদিন শত শত নতুন উপাসনালয় পৃথিবীতে তৈরি হোচ্ছে, তাও উপাসকদের জায়গা হোচ্ছে না। এ ছাড়াও নানাভাবে মানুষ যার যার ধর্মের সমস্ত রকম অনুশাসন প্রাণপণে পালন কোরতে চেষ্টা কোরছে। কি ফল হোচ্ছে? পৃথিবীতে অন্যায়, অবিচার, যুলুমের ক্রন্দন, রক্তপাত, যুদ্ধ, হত্যা কমছে? অবশ্যই নয়, যে কোন পরিসংখ্যান নিঃসন্দেহে বোলে দেবে যে ওগুলো অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে। এই শতাব্দীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধে চৌদ্দ কোটি বনি আদম যে শুধু হতাহত হোয়েছে তাই নয়, ঐ যুদ্ধের পর সংঘাত এড়াবার মানবিক প্রচেষ্টার ফল জাতিসংঘের (United Nations) জন্মের পরও শুধু ২০০০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে ৪০,৯৬৮,০০০ (চার কোটি নয় লক্ষ আটষট্টি হাজার) মানুষ শুধু নিহতই হোয়েছে, আহতদের সংখ্যা স্বভাবতই এর দশ গুণের বেশী (Stockholm International Peace Research Institute)। আর এই নতুন শতাব্দির একটি দিনও অতিবাহিত হয় নি, যেদিন পৃথিবীতে যুদ্ধ ও রক্তপাত হয় নি। শুধুমাত্র ইরাক ও আফগানিস্তানেই নিহত হোয়েছে ১০ লক্ষ মানুষ, মায়ানমার, সিরিয়া, ফিলিস্তিন এসব দেশের কথা বাদই দিলাম। এই মৃত্যুর যে দুঃখ, হাহাকার আর অশ্রু তা কোন পরিসংখ্যানে নেই। এ ছাড়া প্রতিটি দেশে, গরীব, ধনী সব রকম দেশে, পৃথিবীময় খুন, যখম, ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি, দুর্নীতি, রাজনৈতিক দাঙ্গা, হানাহানি- এক কথায় সর্বরকম অপরাধ বাড়ছে এবং লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তাহোলে মানুষের এই যে ধর্ম পালন, অতি নিষ্ঠার সাথে যার যার ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার অনুশীলন, এসব কোরে কি লাভ হলো? কিছুই না। **এগুলোয় কিছুই হবে না বোলেই মানুষ সৃষ্টির বিরুদ্ধে যুক্তিতে মালায়েকরা এ যুক্তি দেন নি যে মানুষ তোমার এবাদত কোরবে না, তোমার উপাসনা কোরবে না, বোলেছিলেন মানুষ ফাসাদ আর সাফাকুদ্দিমা অর্থাৎ অন্যায়, অবিচার, অশান্তি, যুদ্ধ আর রক্তপাত কোরবে (সুরা বাকারা ৩০)।** আল্লাহ মানুষকে ঐ ফাসাদ আর সাফাকুদ্দিমা এড়াবার জন্য একটি মাত্র পথ বোলে দিলেন, আদমকে (আ:) বোলে দিলেন এবং আদমের (আ:) পর তাঁর প্রতিটি নবীর মাধ্যমে মানুষকে বোলে দিলেন। সেই পথটি হোচ্ছে জীবন-বিধাতা (এলাহ) বোলে একমাত্র তাঁকেই, আল্লাহকেই, স্রষ্টাকেই স্বীকার কোরে নেওয়া, অন্য কোন বিধান না মানা, এবং এটাই হলো তওহীদ, উলুহিয়াত (Sovereignty)। কিন্তু মনে রাখতে হবে ঐ তওহীদ আজকের এই **শুধু ব্যক্তিগত জীবনের তওহীদ নয়, পূর্ণ জীবনের তওহীদ, ব্যক্তিগত ও জাতীয় উভয় জীবনের তওহীদ। শুধু ব্যক্তিগত জীবনের তওহীদ হোচ্ছে শেরক। কারণ জাতীয় জীবনে অন্যের বিধান স্বীকার করা, মেনে নেওয়ার অর্থ আল্লাহর অংশীদার স্বীকার কোরে নেওয়া।** আর যে উভয় জীবনে অন্যের বিধান মেনে নিলো, সেতো কাফের।

মানুষকে আল্লাহ এই যে একটিমাত্র শর্ত দিলেন অর্থাৎ শুধু একমাত্র তাকেই প্রভু, এলাহ অর্থাৎ জীবন-বিধাতা বোলে স্বীকার করা, অন্য সর্বরকম বিধান অস্বীকার করা, অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া; এই যথেষ্ট। এটা কেন? এত সংক্ষিপ্ত, এত সহজ, এত ছোট্ট একটি শর্ত, একটা দাবি, এ কেন? এটা এই জন্য যে,

ক) যে সংবিধান, জীবন-বিধান জাতীয় জীবনে মেনে চোললে পৃথিবী থেকে অশান্তি দূর হোয়ে শান্তি আসবে, **তেমন সংবিধান একমাত্র স্রষ্টা ছাড়া আর কেউ তৈরি কোরতে পারবে না, অসম্ভব।** স্রষ্টাকেই একমাত্র বিধান দাতা বোলে স্বীকার কোরে না নিলে তাঁর বিধান মানার প্রশ্ন আসে না। তাই তাঁর শর্ত ও দাবি মানুষের প্রতি এই যে আমাকে ছাড়া আর কাউকে বিধান দাতা, এলাহ বোলে মানবে না।

খ) একবার তাঁকে একমাত্র এলাহ বোলে স্বীকার কোরে জাতীয় জীবনে তাঁর দেওয়া আইন (রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, দণ্ডবিধি সব রকম) প্রতিষ্ঠার পর ব্যক্তিগত অপরাধ নিজে থেকেই প্রায় লোপ পেয়ে যাবে। ব্যক্তিগত অপরাধের নিয়ন্ত্রণের জন্য তাঁর দেওয়া আইনই যথেষ্ট। **কাজেই সর্বপ্রথম ও সব চেয়ে প্রয়োজনীয় হোচ্ছে জাতীয় জীবনে তাঁকে একমাত্র এলাহ বোলে স্বীকার কোরে নেওয়া।** এটা করা হোলে বাদ বাকি আর সব নিজে থেকেই ঠিক হোয়ে যাবে। তাই আল্লাহ বিচারের দিন যার মধ্যেই সাচ্চা তওহীদ পাবেন তাকেই সমস্ত গুনাহ মাফ কোরে দেবেন, অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ কোরবে। এ ব্যাপারে অগুনতি হাদিস ও হাদিসে কুদসী রোয়েছে। এমন কি চুরি ও ব্যভিচারের মত কবিরা গোনাহকারীও জান্নাতে যাবে, যদি সে সাচ্চা, সত্য সত্যই বিশ্বাস করে যে এলাহ, বিধানদাতা, আল্লাহ ছাড়া আর কেই নেই (হাদিস- আবু যর (রাঃ) থেকে বুখারী, মোসলিম ও মেশকাত)। অর্থাৎ জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে সে আর কারো তৈরি আইন-কানুন নিয়ম নির্দেশ মানতে পারে না। অন্যদিকে আল্লাহ কোর'আনে বহুবার বোলছেন আমার ইচ্ছা হোলে আমি আমার বান্দার সব গোনাহ মাফ কোরে দেবো কিন্তু শেরক অর্থাৎ আমার দেওয়া বিধান, আইন-কানুন বাদ দিয়ে অন্যের তৈরি আইন-কানুন গ্রহণকারীকে আমি কখনই মাফ কোরবো না (কোর'আন- সুরা আন নিসা ৪৮)।

আজ পৃথিবীর 'অতি মোসলেমরা' নামাজে, রোজায়, হজ্বে, তাহাজ্জুদে, তারাবিতে, দাড়িতে, টুপি-পাগড়ীতে, পাজামায়, কোর্তায় নিখুঁত। শুধু একটিমাত্র ব্যাপারে তারা নেই, সেটা হলো তওহীদ। যে আংশিক অর্থাৎ ব্যক্তিগত তওহীদ ঐ অতি মোসলেমদের মধ্যে আছে তা আল্লাহ আজও যেমন ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান কোরে রেখেছেন, হাশরের দিনও তেমনি ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান কোরবেন। কারণ তিনি বোলে দিয়েছেন যে, আল্লাহর কেতাবের কোন অংশে বিশ্বাস আর কোন অংশে অবিশ্বাসের **শাস্তি শুধু যে কেয়ামতের দিনে ভয়াবহ হবে তাই নয়, এই দুনিয়ার জীবনেও অপমান, লাঞ্ছনা (কোর'আন- আল বাকারা ৮৫)।**

প্রশ্ন হোল এমন জীবনব্যবস্থা কি সম্ভব যেটা সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে একসঙ্গে শান্তি দিতে পারবে? এর উত্তর হোচ্ছে: হ্যাঁ। এটা সম্ভব হবে যদি সমগ্র মানবজাতি একমাত্র আল্লাহকে তাদের সার্বিক জীবনের বিধানদাতা, এলাহ হিসাবে গ্রহণ কোরে নেয় এবং আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থাকে নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে। এই দীনের একটি নাম হোচ্ছে দীনুল ফেতরাত অর্থাৎ প্রাকৃতিক দীন। কারণ প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোরে আল্লাহ এই জীবনব্যবস্থাটি প্রণয়ন কোরেছেন। আগুন-পানি, আলো-বাতাস, অক্সিজেন ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদানগুলি যেমন পৃথিবীর সকল মানবজাতির জন্য অবশ্য প্রয়োজন এবং সবার উপযোগী, তেমনি এই জীবনব্যবস্থাও পৃথিবীর সর্বত্র প্রযোজ্য, প্রয়োগযোগ্য, গ্রহণযোগ্য ও শান্তিদায়ক। এজন্যই আখেরী নবী, বিশ্বনবী মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর উপাধি আল্লাহ দিয়েছেন রহমাতাল্লেল আলামীন। তাঁর উপর নাযেলকৃত জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিলেই সমস্ত পৃথিবী হবে আল্লাহর রহমতে পরিপূর্ণ। আজকে অন্যায় অশান্তিতে কানায় কানায় পূর্ণ পৃথিবীতে শান্তি আনার জন্য আল্লাহর তওহীদ অর্থাৎ জীবনের সর্ব অঙ্গনে একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে নেওয়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই। ■

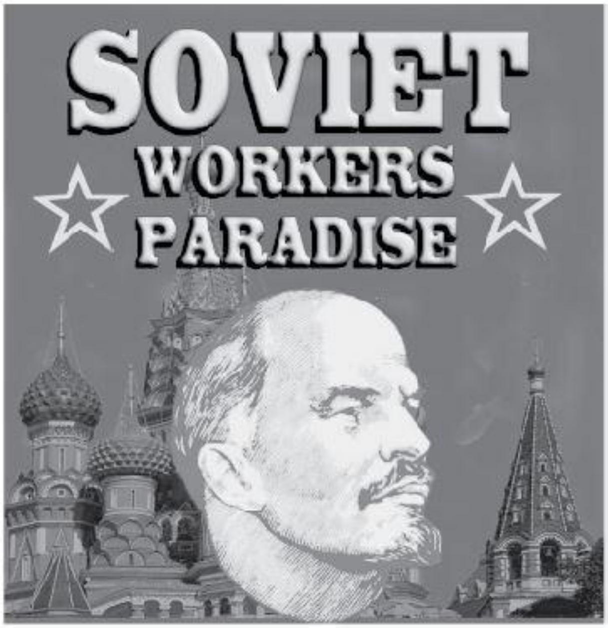

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাদের প্রচারমাধ্যমে এ কথা লক্ষ লক্ষ বার প্রচার করা হোয়েছে যে সাম্যবাদী সমাজে বসবাস করা স্বর্গ সুখে থাকার সমান।

দাজ্জালের জান্নাত-জাহান্নাম এবং কমিউনিজমের স্বর্গ-নরক

১৪০০ বছর ধরে মোসলেম নামধারী জাতিটির ঘরে ঘরে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা চলে আসছে। এ সময়ের মধ্যে দাজ্জাল নিয়ে বহু গবেষণা, বই-পুস্তক আর ফতোয়ার ছড়াছড়ি হয়েছে। কথিত ধর্মনেতারা তাদের ক্ষুরধার মেধাকে কাজে লাগিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওয়াজ কোরেছেন, মানুষকে দাজ্জালের ফেতনা সম্পর্কে অবহিত কোরেছেন। আজও করে চোলেছেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো- সবার অজান্তেই সেই দানব দাজ্জাল ইতোমধ্যেই পৃথিবীতে এসে গেছে। এমনকি শৈশব, কৈশোর অতিক্রম কোরে দাজ্জালের এখন যৌবনকাল চলছে। দোর্দণ্ড প্রতাপে সারা পৃথিবীকে সে তার পদানত করে রেখেছে; সারা পৃথিবীর মানুষকে সে বাধ্য কোরেছে তাকে রব (প্রভু) মানতে। কিন্তু তওহীদের ঝাণ্ডাবাহী মো'মেন ছাড়া কেউ তাকে চিনতে পারছে না, আর তাই প্রতিরোধও করছে না। কারণ আল্লাহর রসুল বলেছেন- লেখাপড়া না জানলেও কেবল মো'মেনরাই তাকে চিনতে পারবে, অন্যদিকে কাফের-মোশরেক ব্যক্তি যতই আলেম (জ্ঞানী) হোক না কেন দাজ্জালকে চিনতে পারবে না।

মানবতার মহাশত্রু, এবলিসের চূড়ান্ত প্রকাশ এই দাজ্জালকে চিহ্নিত কোরেছেন এ যামানার এমাম, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি কোর'আন-বাইবেলসহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাস দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ কোরে দিয়েছেন যে, পাশ্চাত্যের 'বস্তুবাদী ইহুদি-খ্রিস্টান যান্ত্রিক সভ্যতা'ই রসুল বর্ণিত দানব দাজ্জাল, যেটাকে তৎকালীন মানুষের বোঝার সুবিধার জন্য রসুলাল্লাহ রূপকভাবে বর্ণনা কোরেছিলেন। দাজ্জালের জন্ম হোয়েছে আজ থেকে ৪৭৭ বছর আগে ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে। রাষ্ট্র পরিচালনায় খ্রিস্টধর্মের ব্যর্থতার কারণে ১৫৩৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে পৃথক কোরে জন্ম দেয়া হয় ধর্মনিরপেক্ষতার, যার পরিণত রূপ আজকের ইহুদি-খ্রিস্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা' বা দাজ্জাল।

সার্বভৌমত্ব আল্লাহর হাত থেকে মানুষের হাতে তুলে নেবার পর সংবিধান, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি ইত্যাদি তৈরি কোরে মানব জীবন পরিচালনা আরম্ভ হোল, যার নাম দেয়া হোল ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র (Secular Democracy)। এই গণতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব রোইলো মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে। অর্থাৎ মানুষ তার সমষ্টিগত, জাতীয় জীবন পরিচালনার জন্য সংবিধান ও সেই সংবিধান নিঃসৃত আইন-কানুন প্রণয়ন কোরবে শতকরা ৫১ জন বা তার বেশি। যেহেতু মানুষকে আল্লাহ সামান্য জ্ঞানই দিয়েছেন সেহেতু সে এমন সংবিধান, আইন-কানুন দণ্ডবিধি, অর্থনীতি তৈরি কোরতে পারে না যা নিখুঁত, নির্ভুল ও ত্রুটিহীন, যা মানুষের মধ্যকার সমস্ত অন্যায়, অবিচার দূর কোরে মানুষকে প্রকৃত শান্তি (এসলাম) দিতে পারে। কাজেই ইউরোপের মানুষের তৈরি ত্রুটিপূর্ণ ও ভুল আইন-কানুনের ফলে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অন্যায় ও অবিচার প্রকট হোয়ে উঠলো। বিশেষ কোরে অর্থনৈতিক জীবনে সুদভিত্তিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করায় সেখানে চরম

অবিচার ও অন্যায় আরম্ভ হোয়ে গেলো। মুষ্টিমেয় মানুষ ধনকুবের হোয়ে সীমাহীন প্রাচুর্য্য ও ভোগবিলাসের মধ্যে ডুবে গেলো আর অধিকাংশ মানুষ শোষিত হোয়ে দারিদ্র্যের চরম সীমায় নেমে গেলো। স্বাভাবিক নিয়মেই ঐ অর্থনৈতিক অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে ইউরোপের মানুষের এক অংশ বিদ্রোহ কোরলো ও গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রকে বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা কোরলো। ইউরোপের মানুষের অন্য একটা অংশ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অন্যান্য দিকের ব্যর্থতা দেখে সেটা বাদ দিয়ে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কোরলো। অর্থাৎ গণতন্ত্র থেকে একনায়কতন্ত্র, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ এগুলো সবই অন্ধকারে হাতড়ানো, এক ব্যবস্থার ব্যর্থতায় অন্য নতুন আরেকটি ব্যবস্থা তৈরি করা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রকৃতপক্ষে সমষ্টিগত জীবনের ধর্মহীনতা অবলম্বন করার পর থেকে যত তন্ত্র (-cracy), যত বাদই (-ism) চালু করার চেষ্টা ইউরোপের মানুষ কোরেছে সবগুলির সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতেই ছিল। অর্থাৎ রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, একনায়কতন্ত্র, এসবগুলিই মানুষের সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন ধাপ, বিভিন্ন পর্যায় (Phase, step) মাত্র। এই সবগুলি তন্ত্র বা বাদের সমষ্টিই হোচ্ছে এই ইহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতা, দাজ্জাল।

দাজ্জাল সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে রসুলাল্লাহ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, দাজ্জালের সঙ্গে জান্নাত ও জাহান্নামের মত দুইটি জিনিস থাকবে। সে যেটাকে জান্নাত বোলবে সেটা আসলে হবে জাহান্নাম, আর সে যেটাকে জাহান্নাম বোলবে সেটা আসলে হবে জান্নাত। তোমরা যদি তার (দাজ্জালের) সময় পাও তবে দাজ্জাল যেটাকে জাহান্নাম বোলবে তাতে পতিত হয়ো, সেটা তোমাদের জন্য জান্নাত হবে। [আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং আবু হোযায়ফা (রাঃ) থেকে বোখারী ও মোসলেম] আসুন, বর্তমান ইহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতার সাথে হাদিসটিকে মিলিয়ে দেখি।

বর্তমান ইহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতা পৃথিবীর মানবজাতিকে বোলছে- 'মানুষের সমষ্টিগত জীবন যাপনের জন্য আমাদের এই ধর্মনিরপেক্ষ প্রণালীই হোচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের তৈরি করা সংবিধান, সেই সংবিধানের ওপর ভিত্তি করা মানুষের তৈরি করা আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা-ব্যবস্থা ইত্যাদিই সর্বশ্রেষ্ঠ, আধুনিক। তোমরা এই ব্যবস্থা মেনে নাও, গ্রহণ করো তাহোলে তোমরা স্বর্গসুখে বাস কোরবে, তোমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা, চিকিৎসা, জীবনযাত্রার মান এমন উন্নতি হবে, এমন ভোগ-বিলাসে বাস কোরতে পারবে যে তা জান্নাতের সুখের সমান। আর যদি আমাদের এই নীতি তোমরা গ্রহণ না করো, তবে তোমরা দারিদ্র্য, ক্ষুধা আর অশিক্ষার মধ্যে জাহান্নামের কষ্ট ভোগ কোরতে থাকবে।'

পাশ্চাত্য সভ্যতা যে মানবজাতিকে উপরোক্ত কথা বোলছে তা নির্দিষ্ট [illegible] প্রমাণ করার দরকার পড়ে না। পাশ্চাত্যে[illegible]র যন্ত্রগুলি এই কথা প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে, স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে বোলে যাচ্ছে যে তাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা (যার মধ্যে গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও সাম্যবাদ অন্তর্ভুক্ত), তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (যার মধ্যে ধনতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত), তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা (যেটা সম্পূর্ণভাবে জড়বাদী, বস্তুবাদী, যেখানে আত্মার শিক্ষার কোন স্থান নেই), তাদের সামাজিক ব্যবস্থা (যেখানে অবৈধ যৌন কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বোলে গৃহীত, যেখানে সমকামিতা আইনসঙ্গত), তাদের তৈরি করা দণ্ডবিধি সবই

মার্কসীয় অর্থনীতির নিষ্পেষণের শিকার হোয়ে ভিয়েতনামের নাগরিকরা এভাবেই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পালায়, সাগরে ডুবে মারা যায় লাখে লাখে।

সর্বোত্তম, প্রগতিশীল, আধুনিক। ওর চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কিছু হোতে পারে না। ওর বাইরে যত রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-ব্যবস্থা আছে সব গোঁড়া, পশ্চাৎমুখী, প্রতিক্রিয়াশীল, সেকেলে ও হাস্যকর ব্যবস্থা। আল্লাহর রসুল বোলেছেন- যারা দাজ্জালের জীবন-ব্যবস্থা স্বীকার কোরে নেবার ফলে দাজ্জালের জান্নাতে স্থান পাবে তারা দেখবে প্রকৃতপক্ষে তা জাহান্নাম। আর যারা দাজ্জালকে অস্বীকার করার দরুন তার জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে দেখবে তারা জান্নাতে আছে। আল্লাহর রসুলের কথা সত্য কিনা যাচাই কোরে দেখা যাক। এই যাচাইয়ের সময় এ কথা মনে রাখতে হবে যে গণতন্ত্র থেকে ধাপে ধাপে ও পর্যায়ক্রমে সাম্যবাদ (Communism) পর্যন্ত পৌঁছলেও প্রকৃতপক্ষে সমগ্রটা মিলিয়ে একটাই বিষয় ইহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতা, দাজ্জাল এবং দাজ্জালের মৃদু থেকে উগ্রতম রূপ। অন্যভাবে বলা যায় জন্ম থেকে দাজ্জালের ক্রমে ক্রমে বড় হওয়া।

দাজ্জালের অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিস্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই মানুষের একমাত্র গ্রহণযোগ্য সভ্যতা, জীবন-ব্যবস্থা এই প্রচারণায় বিশ্বাস কোরে যে জনসমষ্টি, জাতি বা দেশ তা গ্রহণ কোরেছে অর্থাৎ দাজ্জালের জান্নাতে, স্বর্গে প্রবেশ কোরেছে তাদের অবস্থা পর্যালোচনা কোরলে দেখা যায় প্রতারিত হোয়ে প্রবেশ করার পর অতি শীঘ্রই তারা বুঝতে পেরেছে যে তারা আসলে জাহান্নামে, নরকে প্রবেশ কোরেছে। কথাটা ভালো কোরে বোঝার জন্য দাজ্জালের উগ্রতম রূপ সাম্যবাদ (কমিউনিজমকে) বিবেচনায় নেয়া যাক।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাদের প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে অর্থাৎ রেডিও, টেলিভিশনে-এ কথা লক্ষ কোটি বার বলা হোয়েছে যে সাম্যবাদী সমাজে, দেশে থাকা স্বর্গের সুখে থাকার সমান। যারা ঐ দেশগুলোর রেডিও মোটামুটি নিয়মিতভাবে শুনে এসেছেন তাদের এ কথা বোলে দেবার দরকার নেই। এখানে লক্ষণীয় যে, তারা তাদের সমাজটাকে সর্বদাই স্বর্গ (Paradise) বোলে বাকি পৃথিবীকে সাম্যবাদ গ্রহণ কোরে স্বর্গে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং বিশ্বনবী ঠিক ঐ জান্নাত অর্থাৎ Paradise শব্দটাই ব্যবহার কোরেছেন। দাজ্জালের স্বর্গ Paradise যদি সত্যই স্বর্গ হোয়ে থাকে তবে যারা সেখানে প্রবেশ কোরবে তারা নিশ্চয়ই আর কখনই সেখান থেকে বের হোয়ে আসার চিন্তাও কোরবে না, এ কথা তো আর মিথ্যা হোতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কী হোয়েছে? কমিউনিস্ট ব্যবস্থা গ্রহণ ও কার্যকরী করার কিছু পরই সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেকে বাকি পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন কোরে ফেললো।

সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরে কী হোচ্ছে না হোচ্ছে সে সম্বন্ধে শাসকরা যেটুকু খবর বাইরে যেতে দিতো তার বেশী আর কোন খবর বাকি পৃথিবীর কেউ পেতো না। এই বিচ্ছিন্নতা অতি শিগ্‌গিরই এমন পর্যায়ে যেয়ে পৌঁছলো যে বাকি দুনিয়ায় এর নাম হোয়ে গেলো Iron Curtain, লোহার পর্দা। এ পর্দা এমন দুর্ভেদ্য হোয়ে দাঁড়ালো যে, বিরাট দেশটার সাধারণ সড়ক বা বিমান দুর্ঘটনার খবর পর্যন্ত বাকি দুনিয়ার মানুষ জানতে পারতো না। পরবর্তীতে যখন চীন ঐ জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ কোরলো, দাজ্জালকে রব স্বীকার কোরে দাজ্জালের উগ্রতম পর্যায় সাম্যবাদী জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ কোরলো তখন সেখানেও সেই একই ব্যাপার দাঁড়ালো, চীন বাকি দুনিয়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন কোরে ফেললো এবং এর নাম হোয়ে গেলো Bamboo Curtain, বাঁশের পর্দা।

এই দুই বিরাট দেশের শাসকরা এই বিচ্ছিন্নতার নীতি কেন গ্রহণ কোরলেন? একটা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগের ফলে কোন দেশ জাতি বা সমাজ যদি স্বর্গে পরিণত হয় তবে তো সেই জাতির শাসকদের ঠিক উলটো করা উচিৎ। পর্দা দেবার বদলে তাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য ছিলো সমস্ত দ্বার খুলে দেয়া; বাকি পৃথিবীকে বলা যে- দ্যাখো! আমরা বোলছি আমরা স্বর্গসুখে আছি এ কথা সত্য কিনা। তাদের কর্তব্য ছিলো সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণকে বলা যে, আমরা পাসপোর্ট প্রথা উঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এ স্বর্গ ছেড়ে যদি কোথাও যেতে চাও যাও, কোন বাধা দেবো না। তাদের কর্তব্য ছিলো বাকি পৃথিবীর মানুষকে ডেকে বলা- আমরা ভিসা প্রথা উঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এসে দেখে যাও আমরা জান্নাতে (Paradise) আছি কিনা। পরবর্তীতে ঠিক ঐ ব্যাপার চীনেও হোল। সাম্যবাদ, কমিউনিজমের জন্মের পর থেকে এই সেদিন পর্যন্ত অর্থাৎ স্নায়ুযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত কমিউনিস্ট দেশগুলি যে নিজেদের বাকি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন কোরে রেখেছিলো, তাদের জনগণের সাথে বাইরের পৃথিবীর জনগণের সামান্যতম সংযোগ ছিলো না এ কথা কোন তথ্যাভিজ্ঞ (Informed) মানুষই অস্বীকার কোরতে পারবেন না, এটা ঐতিহাসিক সত্য। ঐ দেশগুলির বাইরের দুনিয়ার সাথে সংযোগ ছিলো শুধুমাত্র ওপরের তলার শাসকদের সঙ্গে, আর কারো সঙ্গে নয়।

শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের ব্যাপারেই নয়, যখনই যে দেশ দাজ্জালের উগ্রতম রূপ কমিউনিজমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার স্বর্গে প্রবেশ কোরেছে, তখনই সে দেশকে সোভিয়েত ও চীনের মত বাকি পৃথিবী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন কোরে ফেলতে হোয়েছে। 'স্বর্গে' প্রবেশ কোরেও ঐ উল্টো নীতি গ্রহণ করা ছাড়া ঐ সব দেশের শাসকদের আর কোন নীতি গ্রহণ করা সম্ভব ছিলো না। তার কারণ হোল এই যে, স্বর্গের প্রতিশ্রুতি পেয়ে সেই স্বর্গে প্রবেশ করার পর সেসব দেশের জনসাধারণ অতি শীঘ্রই বুঝতে পারলো যে এ তো স্বর্গ নয়, এ তো নরক। কিন্তু তখন বেশি দেরি হোয়ে গেছে। তবুও তারা প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে লাগলো ঐ স্বর্গ থেকে বের হোয়ে আসার জন্য। সহজ কথা নয়, কারণ ও স্বর্গ থেকে বের হবার অর্থ নিজেদের দেশ, লক্ষ স্মৃতি জড়ানো প্রিয় জন্মভূমি চিরদিনের জন্য ত্যাগ কোরে সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশে, অচেনা সমাজে বাস করা, যাদের ভাষা পর্যন্ত তাদের অজানা। কিন্তু অনস্বীকার্য ইতিহাস এই যে, ঐসব দেশের জনসাধারণ তাদের জন্মভূমি থেকে পালিয়ে অজানা দেশে চোলে যাবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালিয়ে গেছে। এই চেষ্টায় তারা পরিবারের অন্যদের প্রাণও বিপন্ন কোরেছে, সহায়-সম্পদ বিসর্জন তো ছোট কথা।

কমিউনিস্ট পূর্ব বার্লিন থেকে পশ্চিম বার্লিনে লোক পালিয়ে যাওয়া বন্ধ কোরতে রাশিয়ানরা বিখ্যাত বা

কুখ্যাত বার্লিন দেয়াল তৈরি কোরলো। তবুও মানুষ পালানো বন্ধ করা যায় না দেখে দেয়ালের ওপর প্রতি পঞ্চাশ গজ অন্তর স্তম্ভ (Watch tower) তৈরি কোরে সেখানে মেশিনগান বসানো হোল। হুকুম দেয়া হোল কাউকে দেয়াল টপকে পালাতে দেখলেই গুলি কোরে হত্যা কোরতে। তবু লোক পালানো বন্ধ হয় না দেখে পরিখা খোড়া হোল, কাঁটাতারের বেড়া দেয়া হোল ও নানা রকম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বসানো হোল পলায়নকারীদের খুঁজে বের কোরে হত্যা বা বন্দী করার জন্য। কিন্তু কিছুতেই- 'স্বর্গ' থেকে পালানো বন্ধ করা গেলো না। ঐ সময়ের খবরের কাগজ যারা নিয়মিত পড়েছেন, রেডিও শুনেছেন তাদের কাছে 'স্বর্গ' থেকে পালানোর চেষ্টায় গ্রেফতার, গুলি কোরে হত্যা ইত্যাদি দৈনন্দিন খবর ছিলো। ১৯৪৯ সন থেকে ১৯৬১ সন পর্যন্ত ২৭ লাখ নর-নারী, শিশু কমিউনিস্ট স্বর্গ থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয় এবং ঐ সংখ্যার চেয়ে বহুগুণ ঐ পালাবার চেষ্টায় নিহত হয়, বন্দী হয়।

'স্বর্গ' থেকে পালানোর চেষ্টায় বহু লোক সফল হোয়েছে, বহু লোক বিফল হোয়েছে, বন্দী হোয়েছে, প্রাণ হারিয়েছে। শাসকরা পালানোটা প্রায় অসম্ভব কোরে তোলার পর মানুষ মরিয়া হোয়ে বিকল্প পথ ধরলো। একদল বেলুনে চড়ে রাশিয়ার সীমান্ত পার হোল, অনেকে নদী ও পরিখা সাঁতরে পার হোল, অবশ্য পরিখাগুলি সাঁতরে পার হোতে যেয়ে অনেকে গুলি খেয়ে মারা পড়লো। দু'টি পরিবার এক অভিনব পন্থায় পূর্ব জার্মানি থেকে পশ্চিম জার্মানিতে পালিয়ে এসে সারা পৃথিবীতে সাড়া জাগিয়েছিলো।

পূর্ব ও পশ্চিম ভাগ হোয়ে পূর্ব জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবাধীন একটি কমিউনিস্ট দেশে পরিণত হওয়ার পর রেল লাইনগুলিকে নতুন সীমান্তে দেয়াল দিয়ে বন্ধ কোরে দেয়া হোয়েছিল। ঐ দু'টি পরিবার অতি কৌশল ও চেষ্টায় একটি রেলওয়ে ইঞ্জিন যোগাড় করে। তারপর ঐ দুই পরিবারের নারী ও শিশুদের তাতে উঠিয়ে পুরুষরা তীব্রগতিতে ঐ ইঞ্জিনটি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দেয়াল ভেঙ্গে পশ্চিম জার্মানিতে চোলে আসে। আরও বিভিন্ন উপায়ে বহু নারী-পুরুষ শিশু তাদের প্রিয় জন্মভূমি, দেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সমস্তের মায়া ত্যাগ কোরে প্রাণ হাতে নিয়ে একদিন যেটাকে স্বর্গ ভেবেছিলো তা থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা কোরেছে।

এটা শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপারেই নয়, যে জনসমষ্টিই ইহুদি-খ্রিস্টান যান্ত্রিক সভ্যতার উগ্রতম রূপ কমিউনিজমের স্বর্গে প্রবেশ করার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেটাকে গ্রহণ কোরেছে, তারা অচিরেই বুঝতে পেরেছে যে, তারা নরককে স্বর্গ মনে কোরে তাতে প্রবেশ কোরেছে।

চীনেও ঐ একই ব্যাপার হোয়েছে। মোহভঙ্গের পর হাজার হাজার চীনা তাদের দেশ থেকে বাইরের জগতে পালিয়ে যাবার চেষ্টায় প্রাণ হারিয়েছে, বন্দী হোয়েছে। মূল চীন ভূখণ্ড থেকে সমুদ্র প্রণালী সাঁতরে পার হোয়ে বৃটিশ শাসিত হংকং-এ পালিয়ে যাবার চেষ্টায় বহু চীনা ডুবে মারা গেছে। যুদ্ধে আমেরিকানরা হেরে যাবার পর সম্পূর্ণ ভিয়েতনাম কমিউনিস্টদের হাতে চোলে যাবার পর সে দেশ থেকে মানুষ পালানোর যে বিরাট হিড়িক পোড়ে গিয়েছিলো ও তা বহু বছর পর্যন্ত চোলেছে সে খবর জানা নেই এমন লোক পৃথিবীতে বিরল। ছোট বড় নৌকা বোঝাই কোরে নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ মানুষ সমুদ্রে ভেসেছে। তারা কোথায় পৌঁছবে, কোন্ দেশে আশ্রয় পাবে কিছুই না জেনেও তারা শুধু দাজ্জালের 'স্বর্গ' থেকে পালাবার জন্য মরিয়া হোয়ে যে নৌকায় একশ' জনের স্থান হবে সে নৌকায় পাঁচ সাতশ' মানুষ ভর্তি হোয়ে সমুদ্রে ভেসেছে। হাজার হাজার নৌকা জোর বাতাসে, ঝড়ে ডুবে গেছে, হাজার হাজার নৌকা জলদস্যুরা (Pirates) আক্রমণ কোরে লুটে নিয়েছে, মানুষদের হত্যা কোরে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে, মেয়েদের ধর্ষণ কোরেছে, তাদের বিদেশে বিক্রি কোরে দিয়েছে। এ সমস্ত খবর হাজার হাজার বার সমস্ত পৃথিবীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হোয়েছে, বহু ছবি ওগুলিতে ছাপা হোয়েছে। সেই সব লোমহর্ষক খবর পড়ে, ছবি দেখে

কোরিয়ার যুদ্ধে অ-কম্যুনিস্টদের হাতে বন্দীদের অতি সামান্য সংখ্যকই কম্যুনিজম অধ্যুষিত মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে সম্মত হয়

পৃথিবীর মানুষের হৃদয় কেঁপে উঠেছে। এতো সংখ্যায় এতো বার এই পালানোর চেষ্টা হোয়েছে যে এদের জন্য একটা আলাদা শব্দই সৃষ্টি হোয়েছে- The Boat people - নৌকার মানুষ। পৃথিবীর সমস্ত সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন এখন এদের এই নামেই উল্লেখ করে। ভিয়েতনামেও এসব খবর পৌছেছে, কিন্তু তাতেও ঐ স্বর্গের অধিবাসীদের ফেরাতে পারে নি। তারপরও তারা স্ত্রী-পুরুষ, নারী ও শিশুদের দিয়ে নৌকা অতিরিক্ত বোঝাই কোরে প্রাণ হাতে নিয়ে অজানা সমুদ্রে নৌকা ভাসিয়েছে।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় এমন একটাও দেশ নেই যেখানে 'স্বর্গ' থেকে পলায়নকারী আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য বড় বড় শিবির (Camp) খুলতে না হোয়েছে। এই সেদিন হংকং-এর আশ্রয় শিবির থেকে লোকজনকে ভিয়েতনামের 'স্বর্গে' ফেরত পাঠাবার চেষ্টায় আশ্রয়প্রার্থীদের সাথে হংকং পুলিশের যে তুমুল সংঘর্ষ হোয়ে গেলো, যাতে পুলিশসহ 'স্বর্গের' ভূতপূর্ব বাসিন্দাদের কয়েকজন মারা গেলো সে সংবাদ ও ছবি আমাদের দেশের প্রায় সব সংবাদপত্রেই ছাপা হোয়েছিলো (এটি নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা।)। ঐ একই অবস্থা প্রতিটি সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী দেশের। কমিউনিস্ট কিউবার একটি উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যা এখন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অস্থায়ীভাবে বাস কোরছে আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে।

দাজ্জালের ঘোষিত জান্নাত যে সেটার অধিবাসীদের জন্য প্রকৃতপক্ষে জাহান্নাম তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আমার মনে হয় কোরিয়ার যুদ্ধের একটি ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোরিয়া দেশটি দু'টি ভাগে ভাগ হোয়ে যায়। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া এবং এ ভাগ আজও আছে। দু'টোই দাজ্জালের পূজারী। শুধু তফাৎ হোচ্ছে এই যে দক্ষিণ কোরিয়া দাজ্জালের পূর্বতন পর্যায়ের গণতান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে আছে আর উত্তর কোরিয়া দাজ্জালের উগ্রতর পর্যায়ের সাম্যবাদী একনায়কতান্ত্রিক অর্থাৎ কমিউনিস্ট ব্যবস্থার অধীনে আছে।

১৯৫২ সালে এই দুই কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে গেলো। উত্তর কোরিয়ার সাহায্যে এগিয়ে এলো কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন আর দক্ষিণ কোরিয়ার সাহায্যে এগিয়ে এলো জাতিসংঘের (United Nations) অধীনে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি অনেকগুলো অ-কমিউনিস্ট দেশ। যুদ্ধ চললো তিন বছর। তারপর সন্ধি হোল। সন্ধির অনেকগুলো শর্তের মধ্যে একটি শর্ত হোল যুদ্ধবন্দী বিনিময়। এ বিনিময়ের শর্তের মধ্যে একটি শর্ত হোল এই যে, কোন পক্ষই যুদ্ধবন্দীদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর কোরে ফেরত পাঠাতে পারবে না, যারা নিজেদের ইচ্ছায় তাদের দেশে ফিরে যেতে চাইবে শুধু তাদেরই ফেরত পাঠানো যাবে। যুদ্ধবন্দী বিনিময় হোয়ে যাবার পর দেখা গেলো যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও উত্তর কোরিয়ার অর্থাৎ কমিউনিস্টদের হাতে অ-কমিউনিস্টদের অর্থাৎ আমেরিকান ও অন্যান্য দেশের ১২,৭৬০ (বার হাজার সাতশ' ষাট) জন যুদ্ধবন্দীর মধ্যে ৩৪৭ (তিনশ' সাতচল্লিশ) জন ফিরে আসতে

একসময় তারা চেয়েছিল কম্যুনিজমের স্বর্গসুখ তারা একাই ভোগ কোরবে। তাই গড়ে তুলেছিল বার্লিন প্রাচীর। কিন্তু হায়! সেই স্বপ্ন কিছুদিনের মধ্যেই দুঃস্বপ্নে পরিণত হোল। নিজেদের গড়া সেই স্বর্গীয় প্রাচীরকে ভেঙ্গে চুরমার কোরল নিজেরাই, গ্রহণ কোরল গণতন্ত্র। কিন্তু এ ছিলো ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত চুলায় ঝাঁপ দেওয়া।

অস্বীকার কোরলো, অর্থাৎ তারা কমিউনিস্ট দেশেই থেকে গেলো। এদের মধ্যে ২১ (একুশ) জন আমেরিকানও ছিলো।

অপরদিকে জাতিসংঘের অধীনে দেশগুলোর অর্থাৎ অ-কমিউনিস্টদের হাতে কমিউনিস্টদের ৭৫,৭৯৭ (পঁচাত্তর হাজার সাতশ' সাতানব্বই) জন যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে থেকে নিজেদের দেশে ফিরে যেতে অস্বীকার কোরলো ৪৮,৮১৪ (আটচল্লিশ হাজার আটশ' চৌদ্দ) জন। এত বিপুল সংখ্যক যুদ্ধবন্দী তাদের নিজ দেশে ফেরত না যাওয়ায় জাতিসংঘ এক সমস্যার সম্মুখীন হোয়ে পোড়েছিলো। পরে এদের ফিলিপাইনে, ফরমোসা ও অন্যান্য স্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কোরে দেয়া হয়। যাদের মনে এই সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ বা অবিশ্বাস আসবে তারা কোরিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস, বৃটিশ বিশ্বজ্ঞান কোষ (Encyclopedia Britannica) দেখে নিতে পারেন বা সরাসরি জাতিসংঘে চিঠি লিখে জেনে নিতে পারেন।

এই ঘটনার পর আর কোন সন্দেহ কি থাকতে পারে যে কমিউনিস্টদের বহু ঘোষিত 'স্বর্গ' (Paradise) প্রকৃতপক্ষে সেটার অধিবাসীদের জন্য নরক? ওটা যদি নরক নাও হোয়ে শুধু বাইরের দুনিয়ার অর্থাৎ অ-কমিউনিস্ট দেশ ও জাতিগুলোর অবস্থার মত হতো তবে ঐ হাজার হাজার যুদ্ধবন্দীরা সকলেই অবশ্যই তাদের নিজেদের দেশে ফিরে যেতো। কারণ উভয় স্থানের অবস্থা সমান বা মোটামুটি সমান হলেও একদিকের পাল্লায় রোয়েছে তাদের প্রিয় দেশ, জন্মভূমি, বাবা-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী-ছেলেমেয়ে, বন্ধু-বান্ধব, শৈশবের স্মৃতি জড়ানো বাসস্থান। ঐ সমস্ত বিসর্জন দিয়ে যদি হাজার হাজার মানুষ অজানা দেশের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঝুঁকির সিদ্ধান্ত নেয়, তাহোলে নিশ্চিতই বলা যায় যে, ঐ লোকগুলো তাদের দেশকে জাহান্নাম বা নরক বোলে বিশ্বাস করে। ফেরত না যাওয়া ঐ সংখ্যা থেকেই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, যে ২৬,৯৮৩ (প্রায় সাতাশ হাজার) যুদ্ধবন্দী নিজেদের কমিউনিস্ট দেশে ফিরে গেলো তারা ফিরে গেছে দাজ্জালের স্বর্গের জন্য নয়, গেছে তাদের স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, বাপ-মা'র, বন্ধু-বান্ধবের, আত্মার সাথে জড়ানো, মায়া মমতায় ঘেরা জন্মভূমিকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ কোরতে না পেরে। ঐগুলোর মায়া ত্যাগ কোরতে না পেরে তারা জেনে-শুনেই নরকই বেছে নিয়েছে। সন্ধির শর্তের মধ্যে যদি এই শর্তও যোগ করা হতো যে, যেসব যুদ্ধবন্দী স্বেচ্ছায় নিজেদের দেশে ফিরে যাবে না তাদের পরিবারকেও এনে তাদের কাছে দেয়া হবে তবে এ সাতাশ হাজারের মধ্যে সাতশ' জনও ফিরে যেতো কিনা সন্দেহ আছে।

এখন প্রশ্ন হোল- এ কী রকম 'স্বর্গ' যে স্বর্গের অধিবাসীরা সেখান থেকে পালানোর জন্য প্রাণ হাতে নেয়, সমুদ্র সাঁতরে পার হবার চেষ্টায় ডুবে মরে, ছোট ছোট নৌকায় সমুদ্র পাড়ি দেবার চেষ্টা করে, ইলেকট্রিক কাঁটা তারের শক্ খেয়ে মরে, 'স্বর্গরক্ষীদের' গুলি খেয়ে মরে এবং শত্রুর হাতে বন্দী হোলে জন্মভূমি, স্ত্রী-পুত্রের মায়া ত্যাগ কোরে আবার 'স্বর্গে' ফিরে যেতে অস্বীকার করে! এখানে আরেকটি প্রশ্ন আসে। সেটা হোল- তবে কি যেসব দেশ কমিউনিজম গ্রহণ কোরেছে শুধু সেইসব দেশ জাহান্নামের মত, আর যে সব দেশ করে নি সেগুলো জান্নাতের মত? না, তা নয়। আমি পেছনে বোলে এসেছি যে- জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, সামরিক, আর্থ-সামাজিক ইত্যাদি কোন বিষয়েই খ্রিস্টান ধর্মের কোন নির্দেশনা, এমনকি বক্তব্য পর্যন্ত না থাকা সত্ত্বেও ওটাকে সামগ্রিক জীবনে প্রয়োগের চেষ্টায় অবধারিত ব্যর্থতা যখন ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম দিলো, স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতে এলো তখনই দাজ্জালের জন্ম হোল।

তারপর জন্মের পর যেমন কোন প্রাণি ক্রমে বড় হয়, তার জীবনে একটার পর একটা ধাপ বা পর্ব আসে, তেমনি দাজ্জালের জীবনেও ধাপ, পর্ব (Phase) এসেছে। প্রথমে গণতন্ত্র ও তার অপূর্ণতা ও ত্রুটির কারণে উদয় হোয়েছে একনায়কতন্ত্র (Dictatorship)। ধনতন্ত্রের কুফল ও অবিচারের ফলে এসেছে সমাজতন্ত্র ও তার উগ্রতর রূপ সাম্যবাদ, কমিউনিজম। সময়ে সময়ে ঐ বিভিন্ন পর্যায়ের, ধাপের অনুসারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হোয়েছে, যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র জোট বেঁধে একনায়কতন্ত্রকে ধ্বংস কোরলো। কিন্তু তার পরপরই গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের সাথে সমাজতান্ত্রিক কমিউনিজমের স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াই (Cold war) শুরু হোয়ে গেলো। এই ঠাণ্ডা লড়াই কোরিয়ায়, ভিয়েতনাম ও আরও ছোট খাটো দু'চার জায়গায় প্রকৃত যুদ্ধের (Shooting war) রূপ নিলেও ব্যাপক আকারে হয় নি শুধু একটি মাত্র কারণে। সেটা হোল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের ও সমাজতান্ত্রিক কমিউনিজমের উভয়ের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র ছিলো। উভয়েই জানতো যে এ অস্ত্র ব্যবহার কোরলে উভয়কেই ধ্বংস হোতে হবে। এই পরিস্থিতিই Deterent হিসেবে কাজ কোরে তখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধতে দেয় নি। নিজেদের পরিণামের এই ভয়ই শুধু পৃথিবী ধ্বংসকারী অস্ত্রগুলোকে ব্যবহার করা থেকে উভয়পক্ষকে বিরত রেখেছে। যান্ত্রিক 'সভ্য' ভাষায় এরই নাম Deterent, দা'তাত। কিন্তু মনে রাখতে হবে দাজ্জালের জীবনে শৈশব, কৈশোর, যৌবনের মত পর্যায় আসলেও এবং কখনো কখনো ঐ পর্যায়গুলোর মধ্যে সংঘর্ষ হোলেও দাজ্জাল একটিই, মহাশক্তিধর আত্মাহীন দানব ইহুদি-খ্রিস্টান বস্তুবাদী সভ্যতা, Judeo-Christian Meterialistic Civilization।

কাজেই কমিউনিস্ট উত্তর কোরিয়ার যেসব যুদ্ধবন্দী দেশে ফিরে গেলো না তারা শুধু দাজ্জালের স্বর্গের উগ্রতম অবস্থা থেকে কিছু নম্রতর অবস্থায় ফিরে এলো মাত্র। কোরিয়ার যুদ্ধোত্তর বন্দী বিনিময় অংকের হিসাব প্রমাণ কোরে দিয়েছে মহানবীর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা যেটায় তিনি বোলছেন- দাজ্জালের সঙ্গে একটি জান্নাতের মত আরেকটি জাহান্নামের মত জিনিস থাকবে। সে মানবজাতিকে আহ্বান কোরে বোলবে- আমাকে তোমরা রব (প্রভু) বোলে মেনে নাও (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ত্যাগ কোরে আমার সার্বভৌমত্ব মেনে নাও)। যারা তাকে রব বোলে মেনে নেবে (ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি গ্রহণ কোরবে) সে তাদের তার জান্নাতে স্থান দেবে এবং সেটা তাদের জন্য জাহান্নাম হবে, আর যারা তাকে রব বোলে স্বীকার কোরবে না সে তাদের তার জাহান্নামে দেবে এবং সেটাই তাদের জন্য জান্নাত হবে। ■

রাশিয়ার মোসলেমদের সঙ্গে কথা বোলছেন কমরেড লেনিন (কালো ওভারকোট পরিহিত)। বিশ্বধর্মের পর্যালোচনা করার পর তিনি এসলামে গভীরভাবে প্রভাবিত হোয়েছিলেন। রুশ বিপ্লবের পর তিনি এসলাম ধর্মকে কম্যুনিজমের সহায়ক জীবনব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্র ও এসলামের কূপমণ্ডুক ধর্মজীবী আলেমদের কারণে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

কম্যুনিস্টদের উদ্দেশে দু'টি কথা: এস.এম.সামসুল হুদা

ধর্মব্যবসায়ীদের কূপমণ্ডূকতায় ব্যর্থ হল কমরেড লেনিনের পরিকল্পনা

সারা দুনিয়ায় কিছুদিন আগে বাম আদর্শের জয়জয়কার ছিলো, এখনও বিশ্বের অনেক স্থানে বামপন্থীদের নাম সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। পুরো রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, ভারত উপমহাদেশের বুদ্ধিজীবীমহল, শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ বাম ঘরানার। তাদের প্রতি আমাদের প্রশ্ন হলো- এই বাম আদর্শের উৎপত্তি কেন হলো? আপনারা জানেন যে, ইংল্যান্ডে যখন প্রথম রাষ্ট্রীয়জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা আরম্ভ হোল তখন থেকেই মানুষ জাতীয় চরিত্রে চরম বৈষয়িক ও বস্তুবাদী হোয়ে পড়তে আরম্ভ কোরল। তখন অর্থনীতি ছিল সুদভিত্তিক পুঁজিবাদ এবং শাসনতন্ত্র ছিল সামন্তবাদ। সুদী অর্থনীতির ফলে সমাজের কেউ হোয়ে গেল অকল্পনীয় অর্থ-বিত্তের মালিক আর কেউ হোয়ে গেল দারিদ্র্যের নির্মম শিকার। শিল্পবিপ্লবের ছোঁয়ায় খনিজ সম্পদসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক কাঁচামাল থেকে ব্যবহার্য সামগ্রী উৎপাদনকারী যে বিপুলসংখ্যক কারখানা সৃষ্টি হলো, প্রায় কোটি কোটি মানুষকে একরকম বাধ্য করা হোল সামান্য মজুরিতে সেই কারখানাগুলিতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করার জন্য। সামন্তবাদী রাষ্ট্রগুলিতে এই শ্রমিকবর্গসহ নিম্ন শ্রেণির মানুষগুলোর শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদির কোন ব্যবস্থা রইল না, তারা মানবেতর জীবনযাপন কোরতে বাধ্য হলো। আজকের সংশোধিত পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি দাওয়া ও আন্দোলনের কারণে, শ্রমজীবী মানুষের বিক্ষোভের ভয়ে কিছু কিছু অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু আজ থেকে ১০০ বছর আগেও এই গণতন্ত্রের সমাজব্যবস্থায় শ্রেণিহীন মানুষের দুর্গতির কথা পড়লে চোখের পানি ধোরে রাখতে কষ্ট হয়। এই অবস্থার কারণে ইউরোপের জ্ঞানী-গুণী, বুদ্ধিজীবীরা উদ্বিগ্ন হোয়ে পড়লেন যে, কী কোরে এই মানুষগুলোকে মুক্তি দেয়া যায়? সেই জ্ঞানী-গুণী, মুক্তচিন্তার মানুষগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিলেন কার্ল মার্কস, লেনিন এরা। তারা চেষ্টা কোরলেন মানুষকে অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে মুক্তি দেবার জন্য। যতটুকু বোঝা

যায় তাদের অভিপ্রায় ভালোই ছিল। তখন তারা চিন্তা কোরে দেখলেন যে, ধর্মের মধ্যে সমাধান খুঁজে লাভ নেই, সেগুলি মানুষকে বুঁদ কোরে ফেলে, সেগুলি মানুষের ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিতে অক্ষম।

ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পাশবিক পীড়নের পর বিংশ শতকের গোড়ার দিকে মানবজাতির সামনে আশার বাতি নিয়ে হাজির হোয়েছিল সমাজতন্ত্র নামক মতবাদ। পতঙ্গ যেমন অন্ধ মোহে আগুনের শিখায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি সারা পৃথিবীর তরুণ যুবক সমাজতন্ত্রের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদগ্রীব হোয়ে উঠেছিল। মানুষের ভিতরে বিপ্লবের যে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত থাকে সেটা জাগিয়ে তুলেছিল সমাজতান্ত্রিক পুরোধারা। কিন্তু আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পতঙ্গের যা পরিণতি হয়, অর্থাৎ মৃত্যু; সমাজতন্ত্রের বেলাতেও সেটাই ঘোটেছে। চাকচিক্যময় মাকাল ফল সদৃশ এই মার্কসীয় মতবাদের অভ্যন্তরে যে বিষময় কদর্যতা লুকিয়ে আছে তার প্রকাশ ঘোটতে ৭৫ বছরের অধিক সময় পার হোয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর যে কয়টি স্থানেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হোয়েছিল সেখানেই সৃষ্টি হোয়েছিল চূড়ান্ত ভারসাম্যহীনতা, শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি, পদদলিত হোয়েছিল মানবতা। মানুষের আত্মা ত্রাহিস্বরে চিৎকার কোরে উঠেছিল কেবল মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছা নিয়ে। অথচ এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে মার্কস লেনিন প্রমুখ তাত্ত্বিকরা আখ্যা দিয়েছিলেন 'স্বর্গরাজ্য'। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাদের প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে অর্থাৎ রেডিও, টেলিভিশনে-এ কথা লক্ষ কোটি বার বলা হোয়েছে যে সাম্যবাদী সমাজে, দেশে থাকা স্বর্গের সুখে থাকার সমান। এখানে লক্ষণীয় যে, তারা তাদের সমাজটাকে সর্বদাই স্বর্গ (Paradise) বোলে বাকি পৃথিবীকে সাম্যবাদ গ্রহণ কোরে স্বর্গে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত কঠিন বাস্তবতাই প্রমাণ কোরে দিয়েছে যে সমাজতন্ত্র যে স্বপ্ন দেখিয়েছে সেটা বাস্তবতার ঠিক উল্টো।

কম্যুনিস্টদের এই নিদারুণ ব্যর্থতার কারণ আগেই বোলেছি যে মানুষ কেবল দেহ নয়, তার আত্মাও আছে। এ বিষয়টি উপলব্ধি কোরেছিলেন কার্ল মার্কসের তত্ত্বের বাস্তব রূপকার ভ.ই.লেনিন। কিন্তু এর কোন সমাধান কোরে যেতে পারেন নি দু'টি কারণে। প্রথমত ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্র, এবং দ্বিতীয়ত বিকৃত এসলামের ধারক-বাহক কূপমণ্ডুক মোল্লাদের এসলাম-পরিপন্থী ফতোয়াবাজি।

সমাজতন্ত্রীরা নিজেদেরকে প্রগতিশীল, যুক্তিবাদী, মুক্তচিন্তার ধ্বজাধারী মনে করেন এবং পক্ষান্তরে এসলামসহ সকল ধর্মমতকে একচেটিয়াভাবে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করেন, সকল ধর্মকে স্থবির, কল্পকাহিনী, জড়তা, কূপমণ্ডূকতা বোলে গালিগালাজ করেন, বিশেষ কোরে মোসলেমদেরকে পশ্চাদপদ, গোঁড়া, মধ্যযুগীয়, অন্ধ বলেন। এটা বলেন কেন? এটা বলার কারণ, আপনারা মসজিদে, মাদ্রাসা, খানকার চার দেয়ালের ভেতরে দাড়িওয়ালা-টুপিওয়ালা, লম্বা পাগড়ীওয়ালা লেবাসধারী মাওলানা ও পীর সাহেবদেরকে দেখে মনে করেন এটাই বুঝি এসলাম। কিন্তু না, এটা প্রকৃত এসলাম নয়। টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারের সন্তান, হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী এই প্রচলিত এসলামের অসারতা প্রমাণ কোরেছেন এবং সঠিক এসলামের রূপও মানবজাতির সামনে তুলে ধোরেছেন। তিনি প্রমাণ কোরেছেন যে, প্রকৃত এসলামের অনুসারীরা কখনও স্থবির হোতে পারেন না, প্রকৃত এসলামের চেয়ে বিস্ফোরণমুখী, গতিশীল, বৈপ্লবিক আর কিছু হোতে পারে না। তারা কখনও কূপমণ্ডুক নয়, তাদের সংস্কৃতি রুদ্ধ নয়। দুনিয়াজোড়া তাদের দৃষ্টি। তারা নির্দিষ্ট কোনো পোশাকী গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে পারেন না, কারণ যে জীবনব্যবস্থা এসেছে সারা পৃথিবীর সব ভৌগোলিক পরিবেশের মানুষের জন্য, সেই জীবনব্যবস্থায় কোন নির্দিষ্ট পোশাক থাকতে পারে না; ঠিক যে কারণে গণতন্ত্রে বা সমাজতন্ত্রের কোন নির্দিষ্ট পোশাক নেই। তিনি চলমান বিকৃত এসলামের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস তুলে ধোরে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, গত ১৩০০ বছরে প্রকৃত এসলাম কিভাবে এবং কতভাবে বিকৃত হোয়ে গেছে। ঔপনিবেশিক যুগে ব্রিটিশরা ষড়যন্ত্র কোরে তাদের সকল উপনিবেশগুলিতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরে একেবারে চূড়ান্ত একটা বিকৃত এসলাম শিক্ষা দিয়ে মোসলেম জাতিকে একেবারে বিপরীত দিকে পরিচালিত কোরেছে। এই এসলাম যে কতটা বিকৃত তার একটি প্রমাণ লেনিনের জীবন থেকে দেওয়া যায়। ঘটনাটি আমরা উদ্ধৃত কোরছি মাওলানা শামস নাবীদ উসমানী রচিত Now of Never গ্রন্থ থেকে যা অনুবাদ কোরেছেন স.স.আলম শাহ। অনুবাদ পুস্তক 'বেদ-কুর'আন ও স্বজাতির বিভেদ'। আরও দেখুন উর্দু পত্রিকা 'সোভিয়েত ইউনিয়ন' এর ২৮তম সংখ্যা, ১৯৮২, সূত্রঃ জগদগুরু মুহাম্মদ (সাঃ), রেনেসাঁ পাবলিকেশন্স। পৃষ্ঠা-২০৯-২১০। ঘটনাটি হোল:

রাশিয়ার কমিউনিস্ট বিপ্লবের মহানায়ক কমরেড লেলিন বিশ্বধর্মের পর্যালোচনা করার পর এসলামে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তিনি রুশীয় জনগণের এসলাম গ্রহণের আশা পোষণ কোরতেন। কথিত আছে যে, জনৈক বাকরা খান নামক বুযুর্গের সংস্পর্শে আসার পর তিনি এসলামের প্রতি অনুরক্ত হন। তার দ্বারা লেনিন যথেষ্ট প্রভাবিত হন। যাই হোক, লেনিন সচেষ্ট হোয়েছিলেন, কিন্তু মিশরীয় উলামাদের অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের ষড়যন্ত্রের ফলে এই সুযোগ হাতছাড়া হয়।

রাশিয়ার জার-তন্ত্রের পতনের পর লেনিন হন সর্বময়কর্তা। তিনি কমিউনিস্ট প্রশাসন স্থাপন করেন। একদিন তিনি নিকটতম বন্ধুবর্গের বৈঠক ডাকেন। তাতে তিনি বলেন, 'আমরা সরকার গঠনে সফল হোয়েছি কিন্তু একে সুদৃঢ়, সুবিন্যস্ত, শাশ্বত ও সার্বজনীন কোরে তোলার জন্য আমাদেরকে এমন এক জীবনব্যবস্থা দিতে হবে যা হবে মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানুষের শুধুমাত্র অন্নবস্ত্র-ই যথেষ্ট নয়। আত্মার খোরাকও প্রয়োজন। ক্ষুধার্ত মানুষকে রুটি দিয়ে শান্ত রাখা যায় একটা পর্যায় পর্যন্ত। এ পর্যায় অতিক্রান্ত হোলে মানবাত্মা তৃষ্ণার্ত হোয়ে উঠে। এ তৃষ্ণা নিবারণের কোন উপকরণ-ই আমাদের কাছে নেই। আছে ধর্মাচারের মধ্যে। আমি পৃথিবীর সব ধর্ম-ই গভীরভাবে অধ্যয়ন কোরেছি, সবখানে পেয়েছি আফিমের আবেশ। শুধুমাত্র একটি ধর্মকেই পেয়েছি প্রাণবন্ত (Dynamic) জীবনব্যবস্থা হিসেবে। এক অনিরুদ্ধ গতিময়তা এর মধ্যে বিদ্যমান। এটাই আমাদের প্রগতিশীল জীবন ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সহায়ক বোলে আমার কাছে প্রতীয়মান হোয়েছে। এখন সে ধর্মের

নাম আমি শুধু বোলব। এ ব্যাপারে মত প্রতিষ্ঠায় আপনারা তাড়াহুড়ো কোরবেন না। কেননা প্রশ্নটি কমিউনিজমের জীবন মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত (Don't hasten to form your own conclusions because this question pertains to the life and death of Communism.) আপনারা সময় নিয়ে ভাবনা চিন্তা কোরুন। হতে পারে আমার ধারণা ভুল, কিন্তু আমাদের আত্মপ্রশান্তির জন্য ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা কোরতে হবে। আমি মনে করি যে, এসলামই একমাত্র ধর্ম যার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমাজতন্ত্রের নিকটতম (Islam is the only religion closer to the economic programmes of Communism.)"

এ কথা শুনে সমবেত লোকদের মধ্যে হইচই শুরু হোয়ে যায়। তখন লেনিন তাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা কোরতে নির্দেশ দিয়ে বলেন- আজ থেকে পুরো এক বছর পরে পুনরায় আমরা একত্রিত হব। আর তখনই আমরা ঠিক কোরব কমিউনিস্টদের ধর্মাশ্রয়ী হওয়া উচিৎ হবে কি না, যদি গ্রহণ কোরতেই হয় তাহলে সে ধর্ম কোনটি?"

ব্রিটিশ সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর এ সংবাদ অবহিত হোয়ে এটাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের অশনি সংকেত মনে কোরল। তারা ভাবলো, যদি উদীয়মান শক্তি কমিউনিস্ট রাশিয়া এবং বিপন্ন বিপর্যস্ত আধমরা লড়াকু মোসলেম জনগোষ্ঠী সংঘবদ্ধ হোয়ে যায় , তাহলে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের বিদায় ঘণ্টা বেজে উঠবে। সুতরাং ব্রিটিশ কূটনৈতিকরা তৎপর হোয়ে উঠল বিশ্বব্যাপী। মোসলেম বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া হল এমন এক সংবেদনশীল প্রশ্ন যে কমিউনিজম হলো আল্লাহবিরোধী মতবাদ। এসলামের জন্য আল্লাহদ্রোহী এই মার্কসীয় মতবাদ কি গ্রহণীয় হোতে পারে? ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে মোসলেম বিশ্বের আলেম ওলামার নিকট থেকে ফতোয়া নেয়া হল। একইভাবে এ প্রশ্নে তৎকালিন মোসলেম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞ আলেমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। আলেমগণ এ সংক্রান্ত প্রশ্নের পটভূমি ও এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অবগত ছিলেন না। ফলে আল-আযহারের ওলামাগণ এরূপ নেতিবাচক বিধান প্রকাশ কোরলেন যা ব্রিটিশ প্রশাসন একান্তভাবে চাইছিল। অতঃপর যা হবার তাই হলো। ব্রিটিশ সরকার এ ফতোয়া ছাপিয়ে সারা বিশ্বে বিলি কোরল। এখন পর্যন্ত রাশিয়ার মোসলেম অধ্যুষিত অনেক এলাকায় মোসলেমদের অনেকের কাছে এ ফতোয়ার কপি রয়েছে। এ সংবাদ লেনিনও অবগত হলেন। এতে বিস্ময় প্রকাশ কোরে তিনি বলেন- 'আমার ধারণা ছিল মোসলেমরা কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। কিন্তু বাস্তবে তারা প্রমাণ কোরল, অন্য আর সব ধর্মাবলম্বীদের মত মোসলেমরাও গোঁড়া, তত্ত্বসর্বস্ব ও সংকীর্ণ।' ফলশ্রুতিতে পরিকল্পনা অপূর্ণ থেকে গেল আর লেনিন বিরোধীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

সেদিন লেনিনের এই প্রস্তাব আলেমরা নিতে পারেন নি। কারণ, তখন মদীনা, কায়রো, লাহোর, দিল্লী, কোলকাতা ইত্যাদি জায়গায় যে ব্রিটিশদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় ব্রিটিশ পণ্ডিতদের তৈরি করা সিলেবাস মোতাবেক যে এসলাম শিক্ষা দেওয়া হোচ্ছিল (এবং এখনও হোচ্ছে) সেটি আদৌ আল্লাহ-রসুলের এসলাম নয়। সেই ফতোয়া দানকারী ধর্মব্যবসায়ীরা ছিল কূপমণ্ডূক মোল্লা যারা প্রকৃত এসলামের সাথে সম্পর্কহীন। স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব প্রত্যাখ্যান কোরে তারা ব্রিটিশ বেনিয়াদের তৈরি মতবাদ ও সার্বভৌমত্ব তারা মেনে নিয়েছে। আজও পৃথিবীময় ধর্মব্যবসায়ীদের পণ্যরূপী সেই অন্তঃসারশূন্য, স্থবির এসলামকেই আপনারা দেখছেন এবং অনর্থক আল্লাহ-রসুলের প্রতি বিদ্বেষ লালন ও বিস্তার কোরে যাচ্ছেন।

সেদিন মুক্ত চিন্তার ধারক কমরেড লেনিনের পুরো রাশিয়ার জনগোষ্ঠীর জাতীয় জীবনে এসলামকে সহায়ক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণকে যে ধর্মব্যবসায়ীরা নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান কোরেছিলেন তাদের মনোভাব ছিলো অনেকটা এমন- ঐ ব্যাটা তো নাস্তিক, কাফের। ওকে এসলাম ধর্মের বিধান ব্যবহার কোরতে দিলে তো এসলামের জাত যাবে। আজও একই ধারণা ধর্মজীবীরা পোষণ করেন। তাদের জানা দরকার আল্লাহর রসুলের সময় রসুল যখন প্রকৃত এসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান কোরেছিলেন তখন তাঁর আহ্বানে ইহুদি, খ্রিস্টান, নাস্তিক, মূর্তিপূজক, অগ্নিপূজক সব জাতির মানুষ এসলামের ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হোয়েছিল। এমন কি রসুলাল্লাহ খ্রিস্টান শাসক নাজ্জাশির মৃত্যুর পর সাহাবীদেরকে বোলেছিলেন যে, তোমাদের একজন ভাই মৃত্যুবরণ কোরেছেন। রসুলাল্লাহ নিজে তার জানাজার সালাহ কায়েম কোরিয়েছিলেন। কারণ নাজ্জাশি রসুলাল্লাহর আসহাবদেরকে অকপটে সহযোগিতা কোরেছিলেন। আমরা বিশ্বাস কোরি, যদি মাননীয় এমামুয্যামানের সঙ্গে কমরেড লেনিনের সাক্ষাৎ হোত, আমাদের বিশ্বাস রাশিয়াতে কম্যুনিজমের যাঁতাকলে পড়ে সাধারণ মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত হওয়ার যে দুর্বিসহ অবস্থা সৃষ্টি

১৯৯০-তে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা সুস্পষ্ট হোয়ে যাওয়ায় মার্কসবাদীদের তীর্থভূমি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়, তারপরই সারা দুনিয়ায় সমাজতন্ত্র নিক্ষিপ্ত হয় আস্তাকুড়ে। সে সময়ের গোঁড়া সমাজতান্ত্রিকরা আজও দুর্বল কণ্ঠে সমাজতন্ত্রের জয়গান করেন কিন্তু বাস্তবে তারা সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা মার্কস লেনিনের আদর্শকে বিসর্জন দিয়েছেন এবং বর্তমানে তারা চরম পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অনুসারী। আজ কোন একজন পাক্কা কমিউনিস্টকে এই কথা বোললে অত্যুক্তি হবে না যে, আপনারা পুঁজিপতিদের অধীনে মন্ত্রিত্ব কোরছেন, রাজনীতি কোরছেন, শ্রেণিহীন মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা বাদ দিয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা কোরছেন আর সকল ধর্মের পুরোহিতরা যেমন ধর্মকে বিক্রী কোরে জীবিকা নির্বাহ করেন আপনারাও মার্কস, লেনিন, এঙ্গেলসকে বিক্রী কোরছেন।

কম্যুনিস্ট ভিয়েতনাম থেকে পালানোর চেষ্টায় সলিল সমাধি ঘটে হাজার হাজার মানুষের

হোয়েছিল, সেটা হওয়া সম্ভব হোত না। রাশিয়ার ইতিহাস হোত অন্য।

১৯৯০-তে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা সুস্পষ্ট হোয়ে যাওয়ায় মার্কসবাদীদের তীর্থভূমি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়, তারপরই সারা দুনিয়ায় সমাজতন্ত্র নিক্ষিপ্ত হয় আঁস্তাকুড়ে। সে সময়ের গোঁড়া সমাজতান্ত্রিকরা আজও দুর্বল কণ্ঠে সমাজতন্ত্রের জয়গান করেন কিন্তু বাস্তবে তারা সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা মার্কস লেনিনের আদর্শকে বিসর্জন দিয়েছেন এবং বর্তমানে তারা চরম পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অনুসারী। আজ কোন একজন কমিউনিস্টকে এই কথা বোললে অত্যুক্তি হবে না যে, আপনারা পুঁজিপতিদের অধীনে মন্ত্রিত্ব কোরছেন, রাজনীতি কোরছেন, শ্রেণিহীন মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা বাদ দিয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা কোরছেন আর সকল ধর্মের পুরোহিতরা যেমন ধর্মকে বিক্রী কোরে জীবিকা নির্বাহ করেন আপনারাও মার্কস, লেনিন, এঙ্গেলসকে বিক্রী কোরছেন। আপনারা খামোখা মানুষদেরকে সাম্যবাদের কথা বোলে প্রতারণা কোরে যাচ্ছেন। আপনারা জানেন যে, আপনাদের সিস্টেম ব্যর্থ ও অচল। এখন গণতন্ত্রের দিন এসেছে, তাই সেদিকেই এখন ছাতা ধোরে আছেন। এই কথিত পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অধীনে থাকলে আপনাদের অনেকেরই ব্যক্তিগত জীবন হৃষ্টপুষ্ট হোচ্ছে।

আপনারা যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন আপনাদের প্রতি আমাদের শেষ কথা হোল, যদি আপনারা সত্যিই মানুষের কল্যাণ চান, তবে আপনাদের উচিৎ প্রকৃত এসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা যেটা প্রচণ্ড, দুর্দান্ত গতিশীল এক জীবনব্যবস্থা। সেটা মোল্লাদের কাছে নেই, সেটা আছে আমাদের কাছে। সেটা প্রতিষ্ঠিত হোলে পৃথিবীতে থাকবে না কোন ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ, থাকবে না ধর্ম-বর্ণের কোন ভেদাভেদ, শ্রেণীবৈষম্য, পুরো মানবজাতি হবে এক জাতি। মানব সমাজে এমন অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যে, প্রত্যেকের নিজের মেধা ও পরিশ্রমে উপার্জিত অর্থের উপর যেমন পূর্ণ অধিকার থাকবে, অপরপক্ষে সমাজের প্রতিটি মানুষ স্বচ্ছল হোয়ে যাবে, মানুষ তো দূরের কথা একটি কুকুরও বুভুক্ষ থাকবে না। ধনীর সম্পদে দরিদ্রের ন্যায্য অংশীদারত্ব থাকবে। শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগে তার হাতে মজুরি অর্পিত হবে। মালিক ও শ্রমিক এক টেবিলে বসে খাওয়ার পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি হবে। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার জন্য লাইসেন্স লাগবে না, মিথ্যা না বোলে যত খুশি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা করা যাবে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের আঞ্চলিক সংস্কৃতি অপরিবর্তিত থাকবে, সঙ্গীত, নাট্য, চিত্রকলায় কোনরূপ বাধা আরোপ করা হবে না, কেবল মাত্র যা কিছু মানুষের ক্ষতির কারণ হয় সেগুলি বর্জনীয় বোলে বিবেচিত হবে। আমরা বোলি না যে, আপনারা আল্লাহ বিশ্বাসী হোয়ে যান, মো'মেন হোয়ে যান, পরকালে বিশ্বাসী হোয়ে যান। আল্লাহর প্রতি কে ঈমান আনবে কে আনবে না সেটা তারা আল্লাহর সঙ্গে বুঝবে। সুতরাং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করানো আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ আল্লাহর শেষ রসুলের আনীত আকাশের মত উদার, সমুদ্রের মত বিশাল, দুর্দান্ত গতিশীল এসলামকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরে মানবজাতিকে শান্তিময়, নিরাপদ, ন্যায় ও সুবিচারে পূর্ণ একটি জীবন উপহার দেওয়া। দল, মত, পথ, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, আস্তিক, নাস্তিক নির্বিশেষে সকল মনুব সন্তানের প্রতি আমাদের একটিই প্রশ্ন, আপনি মানবজাতির সার্বিক জীবনে সুখ, শান্তি, উন্নতি, প্রগতি ও ন্যায় চান কি না। যদি চান, তাহোলে একটিই পথ- সেই অপার শান্তিময় জীবনব্যবস্থার রূপরেখা আল্লাহ যামানার এমামকে দান কোরেছেন। আমরা তাঁর পক্ষ থেকে সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা কোরছি। তাই অন্য কারও কথায় প্রভাবিত না হোয়ে জানুন আমরা কী বোলি। ■

যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর লেখা থেকে

যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম হোল

আদম (আ.) থেকে হযরত মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত আল্লাহ অসংখ্য নবী রসুল পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের জাতির কাছে যে জিনিসটা নিয়ে এসেছেন তা হোল তওহীদ অর্থাৎ জাতীয় এবং ব্যক্তিগত জীবনে যেখানে আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের কোন কথা আছে, আদেশ নিষেধ আছে সেখানে আর কারোটা না মানা। নবী রসুলদের মাধ্যমে আসা এই তওহীদের দাবি যখন যে জাতি মেনে নিয়েছে তখন তারা পুরস্কারস্বরূপ, ফলস্বরূপ শান্তিপূর্ণ ভারসাম্যযুক্ত সমাজ পেয়েছে। সে সমাজে কোন অন্যায় অবিচার থাকতো না, যুদ্ধ রক্তপাত থাকতো না।

সমাজে দেহ, আত্মার সুন্দর ভারসাম্য বিরাজ কোরতো। এই নবী রসুল পাঠানোর ধারাবাহিকতায় শেষ রসুল মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনের প্রায় ৫০০ বছর আগে আল্লাহ পাঠালেন ঈসাকে (আঃ)। তাঁকে পাঠানো হোয়েছিল শুধুমাত্র মুসা (আঃ) এর অনুসারী ইহুদি জাতির কাছে। তিনি এসেছিলেন মুসা (আঃ) এর আনীত দীনকে সত্যায়ন কোরে শুধু মাত্র দীনের হারিয়ে যাওয়া আত্মিক ভাগটাকে যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে দীনের ভারসাম্য পুনঃস্থাপনের জন্য। তিনি কখনই খ্রিস্ট ধর্ম নামে নতুন কোন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত কোরতে চাননি। তাঁর জীবনী থেকে একথার প্রমাণ দেওয়া যায়। ঈসা (আঃ) যদি ইহুদিদের বাইরে তার দেখানো পথ অনুসরণ বা গ্রহণ কোরতে বোলতেন তা হোলে তা হোত চরম সীমালংঘন ও অনধিকার চর্চা। কারণ স্রষ্টা তাঁর কাজের সীমারেখা নির্ধারণ কোরে দিয়েছিলেন এবং তা অবশ্যই শুধুমাত্র ইহুদিদের ভেতরে। কোন নবীর পক্ষেই এই সীমারেখা অতিক্রম করা সম্ভব নয়, এবং ইতিহাস সাক্ষী যে ঈসা (আঃ) তা কখনই করেন নি। একজন ইহুদির শুধুমাত্র রোগ সারিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হোলেও তিনি ইতস্তত কোরেছিলেন। তিনি তাঁর সীমারেখার প্রতি ইঙ্গিত কোরে বোলেছিলেন, "I was sent only to the lost sheep of Israel. (Matthew 15:24) অর্থাৎ আমি শুধু মাত্র বনি ইসরাইলের পথভ্রষ্ট মেষ গুলিকে পথ দেখাতে এসেছি। তিনি যখন তাঁর প্রধান ১২ জন শিষ্যকে প্রচার কাজে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন তখন তাদের উপদেশ দিলেন, "Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel." (Matthew 10:5-6) অর্থাৎ "তোমরা অন্যজাতিগুলির কাছে যেও না এবং সামারিয়ান শহরে, নগরে প্রবেশ কোরো না। শুধুমাত্র এসরাইলী পথভ্রষ্ট মেষগুলির কাছে যেতে থাকবে।"

এভাবে ঈসা (আঃ) যখন তাঁর প্রচার কাজ শুরু কোরলেন তখন সেই চিরাচরিত ব্যাপারের পুনরানুষ্ঠান আরম্ভ হোয়ে গেল অর্থাৎ পূর্ববর্তী দীনের, মুসা (আঃ) এর আনীত দীনের ভারসাম্যহীন বিকৃত রূপের যারা ধারক বাহক ছিলেন তারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। সেই পুরোনো কারণ আত্মম্ভরিকতা! কী? আমরা সারাজীবন ধরে তওরাত চর্চা কোরলাম, এর প্রতি শব্দ নিয়ে গবেষণা কোরে কত রকমের ফতোয়া আবিষ্কার কোরলাম, এসব কোরে আমরা রাব্বাই, সাদ্দুসাই হোয়েছি। আর এই সামান্য কাঠমিস্ত্রির ছেলে কি না আমাদের ধর্ম শেখাতে এসেছে! ঈসা (আঃ) তাদেরকে বড় বড় মো'জেজাগুলো দেখানোর পরও তারা কেউই তাঁকে স্বীকার কোরল না। শুধুমাত্র সমাজের নিম্নশ্রেণির হাতে গোনা কিছু ইহুদি তাঁর প্রতি ঈমান আনলো।

দীর্ঘ তিন বছরের প্রচেষ্টায় মাত্র ৭২ জন মতান্তরে ১২০ জন ইহুদি তাঁর উপর ঈমান আনলো ও তাঁর দেখানো পথে চোলতে শুরু কোরল। কিন্তু বিকৃত দীনের ধারক বাহক রাব্বাই, সাদ্দুসাইরা তাদের তখনকার প্রভু রোমানদেরকে এই কথা বোঝাতে সক্ষম হোল যে, ভবিষ্যতে ঈসা (আঃ) রোমানদের প্রভুত্বের ক্ষেত্রে বড় হুমকি হিসাবে আবির্ভূত হবে। ফলে এই পুরোহিতরা রোমানদের সাহায্য নিয়ে ঈসা (আঃ) কে হত্যার চূড়ান্ত ব্যবস্থা কোরল। তখন আল্লাহ তাকে সশরীরে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিলেন এবং তাঁর যে শিষ্য তাঁকে রোমানদের হাতে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল তার চেহারা অবিকল ঈসা (আঃ) এর মত কোরে দিলেন। ফলে তারা তাকে ঈসা (আঃ) মনে কোরে হত্যা কোরল। এই ঘটনার পর ঈসার (আঃ) যে ৭২ জন অনুসারী ছিলো তারা প্রাণভয়ে বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে গেল। গোপনে ব্যক্তিগতভাবে ঈসা (আঃ) এর পথে চলা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় রোইলো না।

কিছুদিন পর পল নামের একজন লোক ঈসা (আঃ) এর উপর বিশ্বাস আনলো। তবে তার পরবর্তী কাজগুলো বিবেচনা কোরলে বোঝা যায় যে, ঈসা (আঃ) এর অনুসারীদের মাঝে ঢুকে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করাই ছিলো তার উদ্দেশ্য। ঈসা (আঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে বারবার যে কাজে সাবধান কোরে দিয়েছিলেন অর্থাৎ অ-ইহুদিদের মাঝে তাঁর শিক্ষা প্রচার করা যাবে না, কিন্তু পল তাঁর অনুসারীদেরকে এই শিক্ষা ইহুদিদের বাইরে প্রচার করার জন্য প্রস্তাব দিলো। প্রথমত ঈসা (আঃ) এর শিষ্যরা তার এই প্রস্তাবে ভয়ানক ভয় পেয়ে গেলেন। কারণ এটা সরাসরি তাদের শিক্ষকের শিক্ষার বিপরীত। কিন্তু পল তাদের মত বদলাতে সমর্থ হোলেন সম্ভবত

এই যুক্তিতে যে, বনি ইসরাইলিদের মধ্যে ঈসা (আ:) এর শিক্ষা প্রচার অসম্ভব যেখানে ঈসা (আ:) নিজে ব্যর্থ হোয়ে গিয়েছেন সেখানে শিষ্যরা যে হতাশ হবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। তাই ঈসা (আ:) এর এই শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে তারা তাঁদের শিক্ষকের সাবধানবাণীকে প্রত্যাখ্যান কোরে এই শিক্ষাকে বাইরে প্রচারের সিদ্ধান্ত নিলেন। পল কিন্তু ঈসা (আ:) এর কাছে থেকে সরাসরি তাঁর শিক্ষা গ্রহণ কোরতে পারেনি, তাই তাঁর শিক্ষার আসল মর্মবাণী সে পায় নি। কিন্তু যখন ঈসা (আ:) এর শিক্ষাকে বাইরে প্রচার করা শুরু হোল তখন পল হোয়ে গেলেন ঐ ধর্মের অন্যতম একজন প্রবক্তা। কাজেই তিনি যে শিক্ষা প্রচার কোরেছিলেন তা যে শুধু ঈসা (আ:) এর ধর্মের থেকে বহু দূরে তাই নয়, প্রধান প্রধান ব্যাপারে একেবারে বিপরীত।

এই প্রচারের ফলে অ-ইহুদিদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য অংশ এই শিক্ষা গ্রহণ কোরে পলের উপদেশ মতো তাদের জীবন পরিচালনা কোরতে লাগলো। পল তার ইচ্ছামত এই শিক্ষাকে যোগ বিয়োগ কোরে নতুন এক ধর্মের সৃষ্টি কোরল। যা মুসা (আ:) এর ধর্মও নয়, ঈসা (আ:) এর আনীত আত্মিক ভাগও নয়, পলের হাতে পড়ে সম্পূর্ণ নতুন এক ধর্মই সৃষ্টি হোয়ে গেল যাকে খ্রিস্ট ধর্ম না বোলে পলীয় ধর্ম বোললেও ভুল হবে না। এই খ্রিস্টধর্মরূপী, কার্যত পলীয় ধর্মটি ক্রমে ক্রমে সমস্ত ইউরোপে গৃহীত হোয়ে গেল। তবে আসল ব্যাপারটা ঘোটলো তখনই। যুগে যুগে মানুষ তদের সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা কোরে এসেছে ধর্মের বিধান দিয়ে। ধর্মের বিকৃত পুরোহিতদের হস্তক্ষেপের ফলে ঐ ধর্মের আসল রূপ বিকৃত হোয়ে গেলেও কিন্তু ঐ বিকৃত রূপকেই ধর্মের বিধান বোলেই চালাতে হোয়েছে।

রাষ্ট্র সর্বদাই চোলেছে ধর্মীয় বিধি বিধান, আইন কানুন দ্বারা। স্বভাবতই খ্রিস্টধর্মকে যখন সমস্ত ইউরোপ একযোগে গ্রহণ কোরে নিল তখন তারাও চেষ্টা কোরল খ্রিস্টধর্মকে দিয়ে তাদের জাতীয় জীবন পরিচালনা করার জন্য। কিন্তু খ্রিস্টধর্মে তো কোন আইন কানুন, দণ্ডবিধি নেই, এটা ইহুদি ধর্মের হারিয়ে যাওয়া আত্মাকে পুনঃস্থাপনের এক প্রক্রিয়ামাত্র। জাতীয় জীবন পরিচালনার জন্য যা কিছু দরকার তা ইহুদিদের কাছে অবিকৃত ছিল। কিন্তু ইহুদি ধর্ম থেকে ঈসা (আ:) এর আনীত আত্মিক ভাগকে পৃথক কোরে ফেলায় খ্রিস্টধর্ম সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা কোরতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হোল। তবুও ঐ চেষ্টা করা হোল এবং কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেলো যে, এ অচল, অসম্ভব। প্রতিপদে ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক অঙ্গনে সংঘাত আরম্ভ হোল। এই সংঘাতের বিস্তৃত বিবরণে না গিয়ে শুধু এটুকু বোললেই চোলবে যে, এই সংঘাত এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ইউরোপীয় নেতা, রাজাদের সামনে দুইটি মাত্র পথ খোলা রোইল। হয় এই জীবন ব্যবস্থা বা ধর্মকে সম্পূর্ণ ত্যাগ কোরতে হবে। আর নইলে তাকে নির্বাসন দিতে হবে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতরে। তৃতীয় আর কোন রাস্তা রোইল না। যেহেতু সমস্ত ইউরোপের মানুষকে নাস্তিক বানানো সম্ভব নয়, কাজেই তারা দ্বিতীয় পথটাকেই বেছে নিলো। অষ্টম হেনরীর সময় ইংল্যাণ্ডে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মকে সার্বিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোরে ব্যক্তিগত জীবনে নির্বাসিত করা হয়। ইংল্যাণ্ডের পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত খ্রিস্টান জগত এই নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগ কোরতে বাধ্য হোল। এরপর থেকে খ্রিস্টান জগতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, আইন দণ্ডবিধি ইত্যাদি এক কথায় জাতীয় জীবনে স্রষ্টার আর কোন কর্তৃত্ব রোইল না। জন্ম হোল ধর্ম নিরেপেক্ষতার।

আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনাটিকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে না হোলেও মানবজাতির ইতিহাসে এই ঘটনাটি সবচেয়ে বড় ঘটনা। এই প্রথম মানুষ তাদের জাতীয় জীবন থেকে ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে। ধর্মকে জাতীয় জীবন থেকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে নির্বাসন দেওয়ার ফলে হয়তো এ আশা করা যেতো যে জাতীয় জীবনে ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড না থাকায় সেখানে যত অন্যায়ই হোক ধর্মের প্রভাবে ব্যক্তি জীবনে মানুষ ন্যায়পরায়ণ ও মানবিক মূল্যবোধ পূর্ণ থাকবে। কিন্তু তাও হয় নি। কারণ মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থার ভার রোইল ঐ ধর্মনিরপেক্ষ অর্থাৎ ধর্মহীন, ন্যায়-অন্যায় বোধহীন জাতীয় ভাগটার হাতে। সুতরাং অনিবার্য ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত জীবন থেকেও ধর্মের প্রভাব আস্তে আস্তে লুপ্ত হোয়ে যেতে শুরু কোরল। স্রষ্টার দেয়া জীবন-বিধানে যে দেহ ও আত্মার ভারসাম্য ছিলো তার অভাবে ঐ শিক্ষা ব্যবস্থায় যে মানুষ সৃষ্টি হোতে লাগলো তাদের শুধু একটি দিকেরই পরিচয় লাভ হোল- দেহের দিক, জড়, স্থূল দিক, স্বার্থের দিক, ভোগের দিক। জীবনের অন্য দিকটার সাথে তাদের পরিচয় বিলুপ্ত হোয়ে গেছে। অর্থাৎ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সৃষ্টি কোরে তা জাতীয় জীবনে প্রয়োগ করার ফলে শুধু জাতীয় জীবনই অন্যায়-অত্যাচার, অশান্তি ও রক্তপাতে পূর্ণ হোয়ে যায় নি, যেখানে ধর্মকে টিকে থাকার অধিকার দেয়া হোয়েছিল অর্থাৎ ব্যক্তিজীবনে, সেখানেও অধিকাংশ মানুষের জীবন থেকে ধর্ম বিদায় নিয়েছে, নিতে বাধ্য হোয়েছে। দেহ থেকে আত্মা পৃথক করার পরিণাম এই হোয়েছে যে, মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ পেয়ে তাদের ব্যক্তিত্ব পশুর পর্যায়ে নেমে গেছে। আপাতদৃষ্টিতে আমরা সমাজে প্রচলিত অন্যায় অপরাধের জন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে দায়ী কোরে থাকি কিন্তু একটু গভীরে গেলেই আমরা দেখবো যে, এই সকল অশান্তির জন্য এই ধর্মনিরপেক্ষ সিস্টেমই দায়ী। মানুষ প্রকৃতপক্ষে কাদামাটির ন্যায়। এই কাদামাটিকে যে ছাঁচ বা ডাইসের মধ্যেই ফেলা হবে, কাদামাটি সেই ডাইসের আকার ধারণ কোরবে। কখনও কোন মানুষ মায়ের গর্ভ থেকে চোর হোয়ে, ডাকাত হোয়ে, অন্যায়কারী, দুর্নীতিবাজ হোয়ে জন্ম নেয় না। কিন্তু অন্যায় সমাজব্যবস্থার প্রভাবে তারা ধীরে ধীরে এমন অপরাধী চরিত্রের হোয়ে যায়। অন্যান্য জাতির মতো আমরাও এমনই এক স্রষ্টা বিবর্জিত আত্মাহীন সিস্টেম গ্রহণ কোরেছি, যার আবশ্যম্ভাবী ফল আমরা এড়াতে পারছি না। মানুষ হোয়ে যাচ্ছে আত্মাহীন জানোয়ার। এই সিস্টেমে খুব সহজেই মানুষের সদগুণাবলীকে অসদগুণাবলী দ্বারা প্রতিস্থাপিত হোচ্ছে। শত চেষ্টা কোরেও মানুষ ভালো হোয়ে থাকতে পারছে না। সুতরাং মানুষকে মনুষ্যত্ব ফিরে পেতে হোলে ধর্মনিরপেক্ষ জীবনব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান কোরে আল্লাহর দেওয়া ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করাই এখন একমাত্র সমাধান। ■

[যোগাযোগ: হেযবুত তওহীদ
০১৭১১০০৫০২৫, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫,
০১৭৮২১৮৮২৩৭, ০১৫৫৯৩৫৮৬৪৭]

ধর্ম ও নাস্তিক্য:
দান ও পুঁজিবাদ

রিয়াদুল হাসান

খ্রিস্ট ধর্ম মানুষের জাতীয় জীবনে শান্তি আনতে ব্যর্থ হওয়ার ফলশ্রুতিতে সংঘটিত রেনেসাঁর পর থেকে স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাস বা সন্দেহ করা ইউরোপ-প্রভাবিত শিক্ষিত সমাজের একটি ফ্যাশনে রূপ নিয়েছে। আধুনিকতা আর ধর্মকে বিদ্রুপ করা যেন সমার্থক হোয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই নিজেকে নাস্তিক হিসাবে প্রচার কোরতে গর্বিত বোধ করেন, তবে তার মানে এই নয় যে তারা সত্যিই নাস্তিক হোতে পেরেছেন। নাস্তিকতার রকমফের আছে যেমন ডগমাটিক বা গোঁড়া নাস্তিক, স্কেপটিক্যাল বা সংশয়বাদী নাস্তিক, ক্রিটিক্যাল বা সমালোচনামূলক নাস্তিক, প্র্যাকটিক্যাল বা বাস্তবমুখী নাস্তিক, অ্যাগনোস্টিক বা অজ্ঞেয়বাদী, ডায়ালেক্টিকেল বা দ্বান্দ্বিক নাস্তিক, সেমান্টিকেল, মার্কসিসটিক, মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি ইত্যাদি। সন্দেহবাদীদের ভিড়ে প্রকৃত নাস্তিক খুঁজে পাওয়া খুবই দুরূহ। তাদের লক্ষণ সম্পর্কে সংক্ষেপে শুধু এটুকু বোলতে পারি, যারা প্রকৃতই নাস্তিক তারা নিজ জন্মদাত্রী জননীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন কোরতেও কোনো আত্মগ্লানী অনুভব কোরবেন না। কারণ ওই কাজ কোরতে ধর্মের নিষেধাজ্ঞা আছে, গণতন্ত্রে বা সমাজতন্ত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, আর প্রকৃত নাস্তিকরা ধর্মকে তথা ঈশ্বরকে বিশ্বাসই করেন না।

যারা প্র্যাকটিক্যাল নাস্তিক তাদের অভিমত হোল আল্লাহ থাকা বা না থাকায় মানুষের কিছু নেই। আল্লাহ ছাড়াও মানুষ চলতে সক্ষম, সবচেয়ে বড় ধর্ম মানবধর্ম- যার সঙ্গে ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক না থাকলেও চোলবে। এরাই ধর্মের সব বিধিব্যবস্থাকে তুলে দিয়ে নিজেদের মনগড়া বিধান দিয়ে মানবসমাজ পরিচালনা কোরতে চান। আজকের যে বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে আমরা বসবাস কোরছি সেটা মূলত এই প্রকার নাস্তিকতা থেকেই উৎসারিত ধর্মনিরপেক্ষতা।

সমাজের একটি বিরাট অংশের মানুষ অন্যের দানের উপর নির্ভরশীল। দরিদ্রকে অর্থ দান সকল ধর্মের শিক্ষা, মহামানব তথা নবী-রসুল-অবতারদের শিক্ষা। হিন্দু, মোসলেম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকল ধর্মমনা ব্যক্তিই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কম বেশি অর্থ দান কোরে থাকে। তারা এই দান করে প্রধানত মানবসেবার মাধ্যমে স্রষ্টার সন্তুষ্টি এবং পরকালীন মুক্তির আশায়।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা জীবনের সকল অঙ্গনকে ধর্মের প্রভাবমুক্ত কোরতে চায়। তারা কি কখনো ভেবে দেখেছে যে সমাজের হতদরিদ্র মানুষগুলির জীবনযাপনের কথা যারা নিজেরা অধিক অর্থ উপার্জনে সক্ষম নয় এবং যারা অচল? সমাজের একটি বিরাট অংশের মানুষ অন্যের দানের উপর নির্ভরশীল। দরিদ্রকে অর্থ দান সকল ধর্মের শিক্ষা, মহামানব তথা নবী-রসুল-অবতারদের শিক্ষা। হিন্দু, মোসলেম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকল ধর্মমনা ব্যক্তিই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কম বেশি অর্থ দান কোরে থাকে। তারা এই দান করে প্রধানত মানবসেবা এবং পরকালীন মুক্তির আশায়। নাস্তিকদের প্রতি আমাদের কথা হলো, এই যে তারা ধর্মকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, স্রষ্টা ও পরকালের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাহোলে এই অভাবগ্রস্ত, আশ্রয়হীন, অন্নহীন বস্ত্রহীনদেরকে তারা কী কোরবে? তারা কি পারবে রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে এই কোটি কোটি মানুষকে বহন কোরতে? এই যে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা আজ কায়েম করা হোয়েছে তা দিন দিন মানুষকে আত্মাহীন পশুতে পরিণত কোরে ফেলছে, উপার্জনে অক্ষম বৃদ্ধ পিতাকে, বৃদ্ধা মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে

পাঠিয়ে দেওয়া হোচ্ছে, অনাত্মীয় দরিদ্র মানুষকে দয়া করার তো প্রশ্নই আসে না। বেশি দিন হয় নি সমাজের মধ্যে কিছু দানশীল লোক থাকতেন যারা নিজের অর্থে সমাজের মানুষের জন্য বহু শিক্ষালয়, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, সরাইখানা, দাতব্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণ কোরে দিতেন। হাজী মোহাম্মদ মোহসীন, রণদা প্রসাদ সাহার নাম আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। ধনীরা দান কোরবে এটাই ছিল স্বাভাবিক, অথচ পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতা মানুষকে এমন পুঁজিবাদী কৃপণে পরিণত কোরছে যে, যে যত ধনী সেই ততো অর্থ-কাঙাল। দান তো দূরের কথা। তারা যদি কোন হাসপাতাল বা স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন তার পেছনেও থাকে অর্থলিপ্সা। দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ার চিন্তা এখন আর তাদের চিন্তা-চেতনায় উদয় হয় না। অথচ একেই বলা হোচ্ছে কল্যাণ রাষ্ট্র, কী বিদ্রুপ। এই কল্যাণ রাষ্ট্র কি পারবে সব দরিদ্র মানুষকে একদিনের আহার যোগাতে? পারবে না। অথচ মানুষ ধর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পরকালের মুক্তির আশায় দান কোরে এই কোটি কোটি মানুষকে দান-খয়রাতের মাধ্যমে প্রতিপালন কোরে যাচ্ছে। এই অভাবী মানুষকে একদিন খাওয়ানোর তো সাধ্য নেই তার উপর পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রভাবে মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও ভারসাম্যহীনতা দিন দিন চূড়ান্ত আকার নিচ্ছে। এক জায়গায় কিছু মানুষ পাহাড়সমান সম্পদের মালিকে পরিণত হোচ্ছে, আরেক জায়গায় মানুষ না খেয়ে মরছে। এটা সৃষ্টি কোরেছে বস্তুবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা। এটা পাশ্চাত্য সভ্যতার সৃষ্টি। ধর্মের কারণেই প্রতিদিন কোনো রকমে এই দরিদ্র মানুষের অন্নসংস্থান হোচ্ছে, সমাজটা এখনো মরতে মরতে টিকে আছে। তা না হোলে তো মানুষের গোশত আজ মানুষ খেতো। ■

এসলাম বিদ্বেষের পেছনের কথা

অধিকাংশ মিডিয়া দাজ্জাল দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত

এস. এম. সামসুল হুদা

আমরা দেখি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম অর্থাৎ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে এসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচারের দ্বারা ঘৃণা বিস্তার করা হয়। যারা ধর্মে বিশ্বাস করেন না, তাদেরকেও দেখি কেবল এসলামের বিরুদ্ধে সোচ্চার। প্রশ্ন হোল, যদি ধর্মেরই বিরোধিতা করা হবে তবে পৃথিবীতে আরও অনেকগুলি ধর্ম আছে, সেগুলি বাদ দিয়ে একচেটিয়াভাবে এসলামের বিরোধিতা করার কারণ কী?

এ প্রশ্নটির পরিপূর্ণ উত্তর পেতে চাইলে আমাদের আজ থেকে ৪৭৭ বছর আগের পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে। সেই সময় আদমের (আ:) সৃষ্টি থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সবচাইতে গুরুতর ও সংকটজনক ঘটনাটি ঘটে। আর তা হোচ্ছে মানবজাতির শত্রু, মানবতার শত্রু এবলিসের চূড়ান্ত রূপ দাজ্জালের আবির্ভাব। পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম মানবজাতি ধর্মকে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় জীবন থেকে প্রত্যাখ্যান কোরে তা নির্বাসিত করে ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতরে। আর জাতীয় জীবন পরিচালনার জন্য জীবনবিধান তৈরির ভার মানুষ নিজের হাতে তুলে নেয়। সিদ্ধান্ত হয়, যার যার ধর্ম সে সে পালন কোরবে কিন্তু রাষ্ট্র থাকবে ধর্মনিরপেক্ষ। সেখানে চোলবে মানুষের তৈরি বিধান। ধর্ম রাষ্ট্রের কোন জাতীয় কাজে হস্তক্ষেপ কোরতে পারবে না। ইউরোপের সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিস্টানজগত এই ব্যবস্থাটিকে গ্রহণ কোরে নেয় সাদরে। কারণ তাদের ধর্মগ্রন্থে অর্থাৎ বাইবেলে জাতীয় জীবন পরিচালনা করার মতো আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইত্যাদি কিছুই ছিলো না। তাই ধর্মগ্রন্থ দিয়ে তাদের রাজকার্য পরিচালনা কার্যত সম্ভবও ছিলো না। তাই ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ বিরাজ কোরছিল যা ইউরোপের অন্ধকার যুগ হিসাবে পরিচিত, এ সময়ের সামাজিক পরিবেশ বোঝাতে 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা' (mediaval barbarism) দুনিয়াময় প্রচলিত জনপ্রিয় বাগধারায় পরিণত হোয়েছে। যেহেতু বাইবেলে রাষ্ট্রীয় বিধান নেই, তাই খ্রিস্টান ধর্মগুরুরা নিজেদের মুখের কথাকেই ঐশ্বরিক বাণী বোলে জাতির উপর চাপিয়ে দিতো। একদিকে রাজা আরেকদিকে গির্জা, এই দুইয়ের যৌথ শাসনে-ত্রাসনে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ হোয়ে ওঠে, তাদের নাভিশ্বাস উঠে যায়। মানুষ গির্জার গোঁড়ামী ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কোরে বসে। মধ্যযুগের অবসান ঘটতে আরম্ভ করে। গির্জার আধিপত্য অর্থাৎ ধর্মের প্রভাবকে অস্বীকার করার মাধ্যমেই শুরু হয় ইউরোপের নতুন একটি যুগ, তাদের ভাষায় আধুনিক যুগ যার সূত্রপাত ধরা হয় খ্রিস্টীয় ১৪৭৫ সন থেকে।

যাহোক, এই ধর্মকে জাতীয় জীবন থেকে বর্জনের মাধ্যমে মানুষ যে জীবনব্যবস্থাটি বরণ কোরে নেয় সেটি স্বভাবতই অপূর্ণাঙ্গ এবং ভারসাম্যহীন। সেখানে মানুষের নৈতিক, আত্মিক কোন শিক্ষা রোইল না, কেবল বাহ্যিক দিক, জড়ের দিকগুলিকে উন্নত করার দিকে লক্ষ্য রাখা হোল। ধর্মের যা কিছু শিক্ষা সব মন্দ, কূপমণ্ডূকতা, গোঁড়ামী, অন্ধত্ব, সেকেলে বোলে প্রচার চালাতে লাগলো লেখক, দার্শনিক, কবিরা। ঔপনিবেশিক যুগে যখন

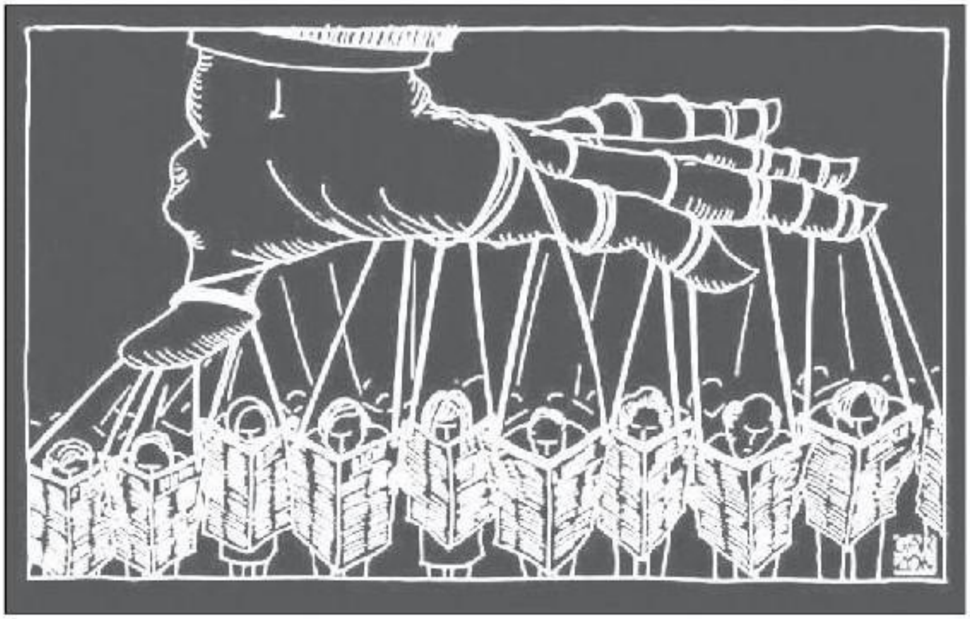

একক পরাশক্তি হিসাবে সমস্ত পৃথিবীকে শাসন কোরছে ইহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতা অর্থাৎ দাজ্জাল। সমস্ত পৃথিবীর প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া তার হাতে। এই প্রচারমাধ্যমের দ্বারা দাজ্জাল পৃথিবীর মানুষকে যা ভাবাতে চায়, তাই ভাবায়; যা বিশ্বাস করাতে চায়, তাই করায়।

পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকায় ইউরোপীয় খ্রিস্টান জাতিগুলি বিশ্বের অধিকাংশ এলাকায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা কোরল, তখন তাদের সেই শিক্ষা, ধ্যান ধারণাই সর্বত্র গৃহীত হোয়ে গেলো। মানবজীবনের লক্ষ্য নির্ধারিত হোল বৈষয়িক উন্নতি, অর্থ উপার্জন, ভোগ। যেহেতু এই নতুন জীবনব্যবস্থায় পরকাল কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, বরং স্রষ্টা এবং পরকালকে এক প্রকার অস্বীকার করার শিক্ষাই মানুষ পেলো, স্বভাবতই লাগামহীন ইন্দ্রিয়পূজায় কোন বাধা থাকলো না, ব্যভিচার, নগ্নতা, মদ্যপানসহ যাবতীয় ভোগবাদিতা অতি স্বাভাবিক চোখে দেখা আরম্ভ হোল, বিজ্ঞাপনী সংস্থার মাধ্যমে নারীকে নিছক ভোগ সামগ্রীতে পরিণত কোরে ফেলা হোল। খাও-দাও-ফুর্তি করো - এটাই হোল মানুষের নতুন জীবনদর্শন। ওপার বোলে কিছু নেই, মরার পরে সব শেষ। আল্লাহ-ঈশ্বর-ভগবান, নরক-জাহান্নাম সবই মানুষের কল্পিত জুজু। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি কোরে ইউরোপীয়দের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হোল আত্মাহীন জড়বাদী একটি 'সভ্যতা'। বর্তমানে সারা পৃথিবী যার হাতের মুঠোয়, সেই ইহুদি খ্রিস্টান জড়বাদী 'সভ্যতা'ই রসুলাল্লাহ বর্ণিত সেই দানব দাজ্জাল। সে বহু আগেই তার শৈশব কৈশোর পার কোরে এখন যৌবনে উপনীত হোয়েছে। বর্তমানে সারা পৃথিবীর এক টুকরা মাটি বা পানি নেই যা দাজ্জালের শক্তি ও প্রভাব বলয়ের বাইরে। মানবজাতির কাছে দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টান সভ্যতা দাবি কোরছে যে, তারা যেন স্রষ্টার সমস্ত বিধি-বিধানকে প্রত্যাখ্যান কোরে একমাত্র তাকেই প্রভু বোলে মেনে নেয়। অর্থাৎ স্রষ্টার সার্বভৌমত্বকে পরিত্যাগ কোরে মানুষের সার্বভৌমত্বকে মেনে নেয়। দাজ্জালের এ দাবির কাছে মানবজাতি আজ আত্মসমর্পন কোরেছে। তাই সমস্ত পৃথিবীতে আজ দাজ্জালের একক আধিপত্য। তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

তবে বর্তমানে সারা পৃথিবীজুড়ে যেভাবে দাজ্জাল বা ইহুদি খ্রিস্টান সভ্যতার একক আধিপত্য জারি রোয়েছে তার জন্য এর জন্মের পর থেকে অনেক পথ অতিক্রম কোরতে হোয়েছে। জন্মের পর থেকে যেমন কোন প্রাণি ক্রমে ক্রমে বড় হয়, তার জীবনে একটার পর একটা ধাপ বা পর্ব আসে, তেমনি দাজ্জালের জীবনেও ধাপ, পর্ব এসেছে। প্রথমে গণতন্ত্র ও তার অপূর্ণতা ও ত্রুটির কারণে উদয় হোয়েছে একনায়কতন্ত্র। ধনতন্ত্রের কুফল ও অবিচারের ফলে এসেছে সমাজতন্ত্র ও তার উগ্রতম রূপ সাম্যবাদ কমিউনিজম। সময়ে সময়ে ঐ বিভিন্ন পর্যায়ের ধাপের অনুসারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হোয়েছে, যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র জোট বেঁধে একনায়কতন্ত্রকে ধ্বংস কোরল, ১৪ কোটি মানুষ নিহত হোল মতবাদের লড়াইয়ে। কিন্তু তারপরই গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের সাথে সমাজতান্ত্রিক কমিউনিজমের স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াই (Cold War) শুরু হোয়ে গেলো। এই ঠাণ্ডা লড়াই কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও আরও ছোট খাটো, দু'চার জায়গায় প্রকৃত যুদ্ধের (Shooting War) রূপ নিলেও ব্যাপক আকারের হয় নি উভয়েরই হাতে পারমাণবিক অস্ত্র থাকার কারণে। অবশেষে ১৯৪৭-১৯৯১ সাল পর্যন্ত চোলল এই ঠাণ্ডা লড়াই। যতোদিন এই লড়াই চোলল, পুঁজিবাদী গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি তাদের পত্র-পত্রিকায়, বিবিসি, ভয়েস অফ আমেরিকা ইত্যাদি রেডিওতে, হলিউডে, ব্রিটেনে নির্মিত চলচ্চিত্রে একচেটিয়াভাবে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার কথা, নির্যাতনমূলক শ্রমব্যবস্থার কথা প্রচার কোরে গেলো,

সেই সঙ্গে প্রচার কোরল পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতার গালগল্প। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নাগরিকরা নব্য-বুর্জোয়া পলিট ব্যুরোর হাত থেকে বাঁচার জন্য গণতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়লো। সোভিয়েত ইউনিয়ন টুকরো টুকরো হোল, বিচূর্ণ হোল বার্লিন প্রাচীর। সমাজতান্ত্রিক কমিউনিজমকে পরাজিত কোরে ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র জয়লাভ কোরল। এই প্রথম দাজ্জাল তথা ইহুদি খ্রিস্টান সভ্যতা সারা পৃথিবীতে একক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হোল। শীতলযুদ্ধ চলাকালে দাজ্জাল কিন্তু কোন বিশেষ ধর্মের বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা-গরম কোন প্রকার যুদ্ধই পরিচালনা করে নি। কম্যুনিজম যখন বাস্তব ময়দান থেকে পিছু হটে মার্ক্স-এঙ্গেলসের কেতাবে গিয়ে ঠাঁই নিলো, দাজ্জালের নিজের মধ্যে আর কোন দ্বন্দ্ব বিভেদ রোইল না। অতঃপর সে নজর দিলো সমস্ত পৃথিবীর ধর্মীয় জাতি গোষ্ঠীর দিকে।

ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির দিকে দাজ্জাল যখন দৃষ্টিপাত কোরল, সে দেখলো যে ইহুদিরা স্রষ্টার দেওয়া শাশ্বত বিধানের যে বিকৃতরূপ ধরে আছে সেটি ব্যক্তিজীবন থেকেও বিলুপ্তপ্রায়, খ্রিস্টানদের দিকে দেখল যে তাদের ধর্ম রবিবারের প্রার্থনা আর ২৫ ডিসেম্বরের বড়দিন পালনের মাঝেই সীমবদ্ধ আছে। বৌদ্ধদের ধর্মজীবন প্যাগোডার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেখানে কিছুলোক মাথা কামিয়ে গেরুয়া বসন পরিধান করে জপমালা হাতে নিয়ে, হাঁটু গেড়ে বোসে "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামী" জপছে। জাতীয়জীবন ব্যবস্থার সাথে তাদের আঁকড়ে ধোরে থাকা ধর্মের লেশমাত্র সম্পর্ক নেই। বৌদ্ধরা সংখ্যায় বিরাট হোলেও তাদের ধর্মে এমন কোন বিধান নেই যা দিয়ে দেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমরনীতি, দণ্ডবিধি অর্থাৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত করা যায়। একইভাবে হিন্দুদের ধর্মও উপাসনাকেন্দ্রিক একটি ধর্মে পরিণত হোয়েছে, মন্দিরের বাইরে তার কোন কর্মকাণ্ড নেই। ধর্মজীবী পুরোহিতদের মধ্যস্থতা ছাড়া হিন্দুদের কোন উপাসনাও করার যো নেই এবং সবচেয়ে বড় কথা হোল, হিন্দু ধর্মেও দাজ্জালের প্রচারিত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কোন বিধিবিধানের অস্তিত্ব নেই। সুতরাং ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মগুলি দাজ্জালের সার্বভৌমত্বকে এবং মতবাদগুলির জন্য কোন ঝুঁকি নয়, ঐসব ধর্মের অনুসারীরা চাইলেও তাদের ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা করা সম্ভব হবে না।

কিন্তু মোসলেম নামক জাতির সঙ্গে অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরাট একটি তফাৎ দাজ্জাল দেখতে পেলো। কারণ এসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। সে দেখলো পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী সে তার বিপরীতে এসলাম ছাড়া সার্বভৌমত্বের উপস্থিতি আর কোথাও নেই। এসলামে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। দাজ্জাল দেখলো যে, এসলামে ব্যক্তিগত জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত পরিচালনার জন্য একটি অসাধারণ ভারসাম্যযুক্ত ব্যবস্থা রোয়েছে। এর মূল গ্রন্থ এখনও অবিকৃতভাবে রোয়েছে যা অন্য ধর্মগুলির বেলাতে নেই। এমন কি এসলামের সঙ্গে তুলনায় গেলে দেখা যাবে দাজ্জালের প্রস্তাবিত গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ইত্যাদি মতবাদগুলি মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনের সমাধান দেয় না, কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে সেগুলি কাজ কোরে থাকে। দাজ্জালের সভ্যতার বিরুদ্ধে গিয়ে আরেকটি সভ্যতার রূপরেখা প্রদান কোরতে সক্ষম কেবলমাত্র এসলামই। যদিও প্রায় অর্ধ পৃথিবী জুড়ে ১৬০ কোটি জনসংখ্যা নিয়ে এই জাতিটি একটি মৃতদেহের মতো পড়ে আছে তবু এখনও তার হৃদস্পন্দন বন্ধ হোয়ে যায় নি, যে কোন সময় আবার জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হোলে এই মরা লাশই আবার উঠে দাঁড়াতে পারে এবং দাজ্জালকে চ্যালেঞ্জ কোরতে পারে। এটা যে কেবল সম্ভাবনার মাঝেই সীমাবদ্ধ তা কিন্তু নয়, মাঝে মাঝেই বিভিন্ন জায়গা থেকে জাগরণী মন্ত্রের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ক্রমেই এই আওয়াজ বৃদ্ধি হোচ্ছে। দাজ্জাল দেখল যে, যে কোন সময় মতবাদ হিসেবে হোক বা জাতি গোষ্ঠী হিসেবে হোক, রাষ্ট্রীয়ভাবে সার্বভৌমত্ব নিয়ে জাতিটি মাথা উঁচু কোরে দাঁড়াতে পারে। সে ভালোভাবেই জানে যে, এই এসলামই এক সময় অর্ধ পৃথিবী শাসন কোরেছিল আর বুদ্ধিমান মাত্রই বুঝতে পারে যে, নিভু নিভু ছাইয়ের আগুন দখিনা বাতাসের স্পর্শ পেলে তা মুহূর্তেই দাউ দাউ কোরে জ্বলে উঠবে। তখন এই আগুন আর ঠেকানো যাবে না। দাজ্জাল আরও চিন্তা কোরল যে, এই মোসলেম জাতি যদি কখনো এসলামের সঠিক আকিদা বুঝতে পারে নিজেদের সোনালী অতীত জানতে পারে এবং কি ভাবে সেই পথে যাওয়া যায় এই পথ নির্দেশ পেয়ে যায় তাহোলেই সর্বনাশ!

দাজ্জাল তার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিহ্নিত কোরতে পেরেই এসলামের বিরোধিতায় লিপ্ত হোয়েছে। যেহেতু সমস্ত পৃথিবীতে সে বর্তমানে একক পরাশক্তি কাজেই সমস্ত পৃথিবীকে শাসন কোরছে এই সভ্যতা। সমস্ত পৃথিবীর প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া তার হাতে অর্থাৎ তার অনুগত। এই প্রচারমাধ্যমের দ্বারা দাজ্জাল পৃথিবীর মানুষকে যা ভাবাতে চায়, তাই ভাবায় যা বিশ্বাস করাতে চায়, তাই করায়। এভাবেই প্রচার মাধ্যমের দ্বারা অপপ্রচার চালিয়ে সে এসলামকে সন্ত্রাসী, জঙ্গি প্রগতিবিরোধী ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে এসলামের ব্যাপারে সবাইকে বীতশ্রদ্ধ কোরে তুলছে। ঠিক যে যে বিশেষণগুলি পশ্চিমা দার্শনিকরা খ্রিস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে পাঁচশত বছর ধোরে ব্যবহার কোরে আসছে সেই শব্দগুলি তারা এখন এসলামের নামে চালিয়ে যাচ্ছে, এমন কি মধ্যযুগীয় বর্বরতা শব্দটিও ব্যবহার কোরছে এসলামের বিরুদ্ধে। মোসলেম হিসাবে মাথা তুলতে গেলেই তাদেরকে জেল দিচ্ছে, ফাঁসি দিচ্ছে, বেয়নেট দিয়ে, গুলি কোরে হত্যা কোরছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে গেলে দাজ্জাল সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ কোরছে, নিষেধাজ্ঞা আরোপ কোরছে। এতে যদি সে রাষ্ট্র তার অনুগত না হয় তাহোলে বিভিন্ন অজুহাতে ঐ রাষ্ট্র আক্রমণ কোরে ধ্বংস কোরে সেখানে তার ইচ্ছামত অনুগত সরকারকে বোসিয়ে দেয়।

এভাবেই দাজ্জাল তথা ইহুদি খ্রিস্টান বস্তুবাদী সভ্যতা প্রচার মাধ্যম, অর্থবল এবং সবশেষে সামরিক শক্তি দিয়ে সর্বতোভাবে এসলামের বিরোধিতায় সর্বশক্তি নিয়োগ কোরেছে। কিন্তু অন্য কোন ধর্ম তার শাসনের ক্ষেত্রে হুমকি না হওয়ায় সে তাদের প্রতি সহনশীল, নমনীয়, সেগুলির অসারতা প্রমাণের জন্য তার তেমন কোন ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হয় না। ■

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর লেখা থেকে সম্পাদিত

অন্ধ বিশ্বাস নয়, যুক্তিই ঈমানের ভিত্তি

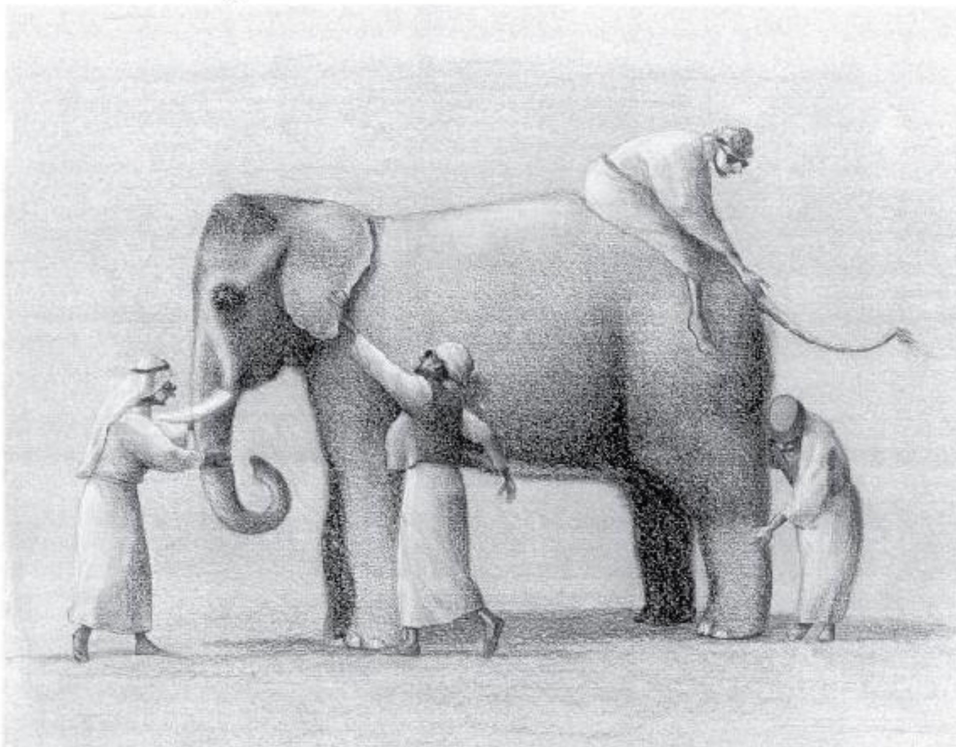

ঈমানের চেয়ে আকিদা বেশি দরকারি:

এই দীনের প্রায় সকল আলেম একমত যে, আকিদা সহীহ্ না হোলে ঈমানের কোনো দাম নেই। সেই মহা গুরুত্বপূর্ণ আকিদা বিষয়টি কী তা ভালো কোরে বুঝে নেওয়া অতীব জরুরি। বর্তমানে ঈমান ও আকিদা একই বিষয় বোলে ধরা হয়, আসলে তা ঠিক নয়। ঈমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। আর আকিদা শব্দের অর্থ হোল কোনো বিষয় সম্বন্ধে সঠিক ও সম্যক ধারণা (Comprehensive concept)। কোন জিনিস কি উদ্দেশ্যে তৈরি করা হোয়েছে তা সঠিকভাবে জানার নামই হোল আকিদা অর্থাৎ ঐ জিনিস সম্পর্কে আকিদা সহীহ্ হওয়া। যদি কোন জিনিসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা ভুল হয় তাহোলে ঐ জিনিসের উপর করা যাবতীয় কাজও ভুল হোয়ে যাবে। যেমন একটা গাড়িকে বানানোর উদ্দেশ্য হোল আপনাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আনা নেওয়া করা। ঐ উদ্দেশ্য পূরণার্থে অর্থাৎ সহজ করার লক্ষ্যে, আরামদায়ক করার লক্ষ্যে এর ভেতরে বসার জন্য চামড়ার নরম গদি বসানো হয়। গান শোনার জন্য ক্যাসেট প্লেয়ার বা সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা হয়। গরম বা ঘাম থেকে বাঁচার জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বসানো হয়। এসব ব্যবস্থা দেখে যদি কেউ মনে করে এটা একটা বাড়ি এবং এটাকে বানানো হোয়েছে বসবাস করার জন্য, তাহোলে ঐ গাড়ি সম্পর্কে তার আকিদা ভুল হয়ে গেল। সুতরাং সেই ব্যক্তি যেহেতু এর আসল উদ্দেশ্য জানে না, সেহেতু সে এই গাড়ি চড়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাবে না, সুতরাং তার গাড়িটি অর্থহীন হোয়ে যাবে যদি তা পৃথিবীর সবচাইতে দামি গাড়িও হয়। সুতরাং আমাদের ভালো কোরে জানা দরকার যে, আল্লাহ আমাদের কেন সৃষ্টি কোরেছেন, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী, নবী রসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য কী, কেতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য কী, জাতি গঠনের উদ্দেশ্য কী, সালাহ্, সওম, হজ্ব, যাকাহ্, ইত্যাদি দেওয়ার উদ্দেশ্য কী? এসব বিষয়ের সঠিক উদ্দেশ্য জানা না থাকলে আমল কোরেও কোনো ফল পাওয়া যাবে না।

রসুলাল্লাহর পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য:

আল্লাহ পবিত্র কোরআনের অন্তত তিন স্থানে বোলেছেন, "হেদায়াহ ও সত্যদীন দিয়ে আমি আপন রসুল প্রেরণ কোরেছি, তিনি যেন এটাকে (হেদায়াহ ও সত্যদীনকে) অন্যান্য সমস্ত দীনের উপর বিজয়ী করেন (সুরা-ফাতাহ: ২৮, সুরা-সফ: ৯, সুরা-তওবা: ৩৩)। এই আয়াতে পরিষ্কার দুটি বিষয় দেখা যায়। প্রথমটি হোল হেদায়াহ ও সত্যদীন আর দ্বিতীয়টি হোল অন্যান্য সমস্ত দীনের উপর এই হেদায়াহ ও সত্যদীনকে প্রতিষ্ঠা করা। তাহোলে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আমাদের মহানবীর উপর নাজেল কোরলেন হেদায়াহ ও সত্যদীন এবং তাঁকে দায়িত্ব দিলেন এটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এই কাজ করার জন্য নীতি হিসাবে দিলেন সর্বাত্মক সংগ্রামের। আল্লাহর রসুল তাই বোলেছেন- আমি আদিষ্ট হোয়েছি মানবজাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম (কেতাল) চালিয়ে যেতে যে পর্যন্ত না সমস্ত মানুষ আল্লাহকে একমাত্র এলাহ এবং আমাকে তাঁর রসুল বোলে মেনে নেয় (হাদিস- আবদাল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে- বোখারী, মেশকাত)। যতদিন এই প্রত্যক্ষ দুনিয়ায় তিনি ছিলেন এক দেহ এক প্রাণ হয়ে তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। এই কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা তদানীন্তন আরবের এক বিরাট এলাকা আল্লাহর হুকুমের অধীনে নিয়ে আসলেন। তারপর তিনি প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন, তবে যাওয়ার আগে তার বাকি কাজ অর্থাৎ সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে বাকি দুনিয়াতে দীনুল হক প্রতিষ্ঠা করার ভার দিয়ে গেলেন তাঁর সৃষ্ট জাতির উপর, তাঁর উম্মাহর উপর। বিশ্বনবীর লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উম্মাহ তাদের বাড়িঘর, স্ত্রী-পুত্র, ব্যবসায়-বাণিজ্য এক কথায় দুনিয়া ত্যাগ করে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতার অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ কোরতে দেশ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল। মাত্র দশ বছরের মধ্যে তদানীন্তন দুটি বিশ্বশক্তি রোমান এবং পারসিক সাম্রাজ্য উম্মতে মোহাম্মদীর সামনে তুলার মত উড়ে গেল এবং অর্ধ-পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা হোল। ৬০/৭০ বছর পর দুর্ভাগ্যজনকভাবে পরবর্তী উম্মাহ্ তাদের আকিদা ভুলে গেল। ভুলে গেল কেন তাদের তৈরি করা হোল। তাদের তৈরি করা হয়েছিল কঠোর অধ্যবসায় অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত দুনিয়াতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবজীবন থেকে অন্যায়, অশান্তি, যুদ্ধ, রক্তপাত, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ইত্যাদি দূর কোরে এক অনাবিল শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

এই দীনের সকল বিকৃতির মূল কারণ হোল আকিদার বিকৃতি:

এসলামের আকিদা যখন বিকৃত হোতে আরম্ভ করে, তখন থেকে একটা একটা কোরে প্রতিটি বিষয়েই বিকৃতি ও ভ্রান্তি প্রবেশ করতে থাকে। আকিদার বিকৃতির অন্যতম ফল হিসাবে দেখা দেয় অন্ধ বিশ্বাস। বর্তমানে এসলামের শত্রুরা যে সমস্ত কারণে এসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার কোরে থাকে, অন্ধবিশ্বাস তার মধ্যে একটি। তাদের এই মনোভাবের পেছনে প্রকৃত এসলাম সম্পর্কে অজ্ঞানতা বহুলাংশেই দায়ী। আকিদা বিকৃত হোয়ে গিয়েছিল বলেই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য ত্যাগ কোরেছিল। মহানবী (দঃ) ও তাঁর সাক্ষাৎ অনুসারী আবু যার (রাঃ) বোলেছিলেন, "জেহাদ হোচ্ছে এই জাতির সবচেয়ে বড় দায়িত্ব, সবচেয়ে বড় কর্তব্য।" আর আবু বকর (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হোয়ে তাঁর প্রথম ভাষণেই বোলেছিলেন, "হে মোসলেম জাতি, তোমরা কখনও জেহাদ ত্যাগ কোরো না। জাতি জেহাদ ত্যাগ কোরলে আল্লাহ তাকে অপমান, অপদস্থ না কোরে ছাড়েন না।" ঐ আকিদা বিকৃত না হোলে তো আর জেহাদ ত্যাগই করা হোত না। তাই বলা যায়, আকিদার বিকৃতিই সংগ্রাম ত্যাগ করার কারণ। ঐ আকিদা বিকৃত হোয়ে এই আকিদা স্থান কোরে নিলো যে নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ও অন্যান্য নানা রকম 'ধর্ম পালন' কোরলেই ভালো মোসলেম হওয়া যায় ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় এবং আল্লাহর রসুলের (দঃ) কতগুলি ব্যক্তিগত অভ্যাস নকল করা হোলেই তাঁর সুন্নাহ পালন করা হয়। এই বিকৃতির অবশ্যম্ভাবী ফল এই হোল যে- কেমন কোরে ঐ 'ধর্মকর্ম' পালন কোরলে তা নিখুঁত হয় তা নিয়ে গবেষণা, চুলচেরা বিচার। ঐ বিচারের ফলে স্বভাবতঃই নানা অভিমত ও নানা সিদ্ধান্ত; ঐ সব সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি কোরে এই জাতির বিভিন্ন মাজহাবে, ফেরকায় বিভক্তি ও শত্রুর হাতে পরাজয় ও ঘৃণ্য দাসত্ব, আবু বকরের (রাঃ) সাবধানবাণীর সত্যায়ন। চিন্তা কোরলে দেখা যায় আবু বকরের (রাঃ) ঐ সাবধানবাণীর মর্মার্থ আরও গভীর ছিল। কারণ এই দীনে যে হাজার রকম বিকৃতি আজ পর্যন্ত এসেছে সবগুলোর মূলে ঐ সংগ্রাম ত্যাগ। স্বভাবতঃই, কারণ যে কোন জিনিসেরই মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য হারিয়ে গেলে বাকি যা থাকে তা অর্থহীন, বিকৃত হোয়ে যায়। এ দীনেরও তাই হোয়েছে এবং ঐ সর্ববিধ বিকৃতির একটি হোচ্ছে, অন্ধ বিশ্বাস।

এসলামে অন্ধ বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই:

আল্লাহর কোর'আন যিনি ভাসাভাসা ভাবেও একবার পড়ে গেছেন তিনিও লক্ষ্য না কোরে পারবেন না যে- চিন্তা-ভাবনা, যুক্তির উপর আল্লাহ কত গুরুত্ব দিয়েছেন। "তোমরা কি দেখ না? তোমরা কি চিন্তা করো না?" এমন কথা কোর'আনে এতবার আছে যে সেগুলোর উদ্ধৃতি কোন প্রয়োজন পড়ে না। এখানে শুধু দু'একটির কথা বোলছি এর গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য। চিন্তা-ভাবনা, কারণ ও যুক্তির উপর আল্লাহ অতখানি গুরুত্ব দেওয়া থেকেই প্রমাণ হোয়ে যায় যে এই দীনে অন্ধ বিশ্বাসের কোনও স্থান নেই। তারপরও তিনি সরাসরি বোলছেন-"যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই (অর্থাৎ বোঝ না) তা গ্রহণ ও অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয়ই তোমাদের শোনার, দেখার ও উপলব্ধির প্রত্যেকটিকে প্রশ্ন করা হবে (কেয়ামতের দিনে) (কোর'আন- সুরা বনি ইসরাইল ৩৬)।" কোর'আনের এ আয়াতের কোন ব্যাখ্যা প্রয়োজন পড়ে না। অতি সহজ ভাষায় আল্লাহ বোলছেন জ্ঞান, যুক্তি-বিচার না কোরে কোন কিছুই গ্রহণ না কোরতে। অন্য বিষয় তো কথাই নেই, সেই মহান স্রষ্টা তাঁর নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও কোর'আনে বহুবার বহু যুক্তি দেখিয়েছেন। অথচ তাঁর নিজের সম্পর্কে বলার কোন প্রয়োজন ছিল

না, কারণ আল্লাহ কারও ঈমানের মুখাপেক্ষী নন। তারপরও তিনি তাঁর একত্ব, তিনি যে এক, তাঁর কোন অংশীদার, সমকক্ষ নেই, অর্থাৎ একেবারে তাঁর ওয়াহদানিয়াত (একত্ব) ও উলুহিয়াত (সার্বভৌমত্ব) সম্পর্কেই যুক্তি তুলে ধোরেছেন। বোলছেন- "বল (হে মোহাম্মদ), মোশরেকরা যেমন বলে তেমনি যদি (তিনি ছাড়া) আরও সার্বভৌমত্বের অধিকারী (এলাহ) থাকতো তবে তারা তাঁর সিংহাসনে (আরশে) পৌঁছতে চেষ্টা কোরত (কোর'আন- সুরা বনি ইসরাইল ৪২)। আবার বোলছেন- "আল্লাহ কোন সন্তান জন্ম দেন নি; এবং তাঁর সাথে আর অন্য কোনও সার্বভৌম (এলাহ) নেই, যদি থাকতো তবে প্রত্যেকে যে যেটুকু সৃষ্টি কোরেছে সে সেইটুকুর পৃষ্ঠপোষকতা কোরতো এবং অবশ্যই কতগুলি (এলাহ-সার্বভৌম হুকুমদাতা) অন্য কতকগুলির (এলাহ) উপর প্রাধান্য বিস্তার কোরতো (কোর'আন- সুরা আল-মো'মেনুন ৯১)।" এমনি আরও বহু আয়াত উল্লেখ করা যায় যেগুলিতে আল্লাহ মানুষের জ্ঞান, বিবেক, যুক্তির, চিন্তার প্রাধান্য দিয়েছেন, সব কিছুতেই ঐগুলি ব্যবহার কোরতে বোলেছেন, চোখ-কান বুঁজে কোন কিছুই অনুসরণ কোরতে নিষেধ কোরেছেন। আল্লাহ যেমন একেবারে তাঁর নিজের অস্তিত্ব ও একত্বের ব্যাপারেও যুক্তি উপস্থাপিত কোরেছেন, (একটু পেছনেই যা উল্লেখ কোরে এলাম) তেমনি তাঁর রসুল (দঃ) তাঁর ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাসের ব্যাপারেও বোলছেন- 'আমার ঈমানের ভিত্তি ও শেকড় হোল যুক্তি।' এছাড়া কোর'আনময় আল্লাহ তাঁর সার্বভৌমত্বের সম্পর্কে যুক্তি উত্থাপন কোরে গেছেন এবং বোলেছেন এবং কারও সাধ্য থাকলে তা খণ্ডানোর আহ্বান (Challenge) জানিয়েছে। তিনি যে দীন মানবজাতিকে দান কোরেছেন তা গ্রহণ কোরে নিতে তিনি মানবজাতিকে জোর না কোরে তিনি তাঁর দীনের শ্রেষ্ঠত্ব যুক্তিসহকারে উপস্থাপন কোরেছেন এবং তা মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রশ্ন কোরেছেন, "যিনি সৃষ্টি কোরেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মতম বিষয়ও জানেন" (সুরা মূলক ১৪)।

এসলামে অন্ধ বিশ্বাস কোনভাবেই স্বীকৃত নয়। এসলামের অপর নাম দীনুল ফেতরাত বা প্রাকৃতিক দীন যা স্বাভাবিকের উপর, যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্ধ বিশ্বাস তো দূরের কথা আল্লাহ ও রসুলের (দঃ) প্রেমে ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত হোয়েও যে যুক্তিকে ত্যাগ করা যাবে না, তা তাঁর উম্মাহকে শিখিয়ে গেছেন মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক মোহাম্মদ (দঃ)। একটি মাত্র শিক্ষা এখানে উপস্থাপন কোরছি। ওহোদের যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় তাঁর তলোয়ার উঁচু কোরে ধোরে বিশ্বনবী (দঃ) বোললেন- "যে এর হক আদায় কোরতে পারবে সে এটা নাও।" ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) লাফিয়ে সামনে এসে হাত বাড়িয়ে বোললেন-"ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আমাকে দিন, আমি এর হক আদায় কোরবো।" মহানবী (দঃ) তাকে তলোয়ার না দিয়ে অন্যদিকে ঘুরে আবার বোললেন- "যে এর হক আদায় কোরতে পারবে সে নাও।" এবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবা যুবায়ের বিন আল আওয়াম (রাঃ) লাফিয়ে এসে হাত বাড়ালেন- "আমি এর হক আদায় করবো।" আল্লাহর রসুল (দঃ) তাকেও তলোয়ার না দিয়ে অন্যদিকে ঘুরে আবার ঐ কথা বোললেন, এবার আনসারদের মধ্যে থেকে আবু দুজানা (রাঃ) বিশ্বনবী (দঃ) সামনে এসে প্রশ্ন কোরলেন- "হে আল্লাহর রসুল! এই তলোয়ারের হক আদায়ের অর্থ কি?" রসুলাল্লাহ জবাব দিলেন- 'এই তলোয়ারের হক হোচ্ছে এই যে এটা দিয়ে শত্রুর সঙ্গে এমন প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করা যে এটা দুমড়ে, ভেঙ্গে চুরে যাবে।" আবু দু'জনা (রাঃ) বোললেন- 'আমায় দিন, আমি এর হক আদায় করবো।" বিশ্বনবী (দঃ) আবু দু'জনা (রাঃ) হাতে তাঁর তলোয়ার উঠিয়ে দিলেন (হাদিস ও সীরাতে রসুলাল্লাহ- মোহাম্মাদ বিন এসহাক)। একটা অপূর্ব দৃষ্টান্ত- শিক্ষা যে, অন্ধবিশ্বাস ও আবেগের চেয়ে ধীর মস্তিষ্ক, যুক্তির স্থান কত উর্ধ্বে। ওমর (রাঃ) ও যুবায়ের (রাঃ) এসেছিলেন আবেগে, স্বয়ং নবীর (দঃ) হাত থেকে তাঁরই তলোয়ার! কত বড় সম্মান, কত বড় বরকত ও সৌভাগ্য। ঠিক কথা। কিন্তু আবেগের চেয়ে বড় হোল যুক্তি, জ্ঞান। তারা আবেগে ও ভালোবাসায় জিজ্ঞাসা কোরতে ভুলে গেলেন যে মহানবী (দঃ) যে হক আদায় করার শর্ত দিচ্ছেন, সেই হকটা কী? আবু দু'জানার (রাঃ) আবেগ ও ভালোবাসা কম ছিল না। কিন্তু তিনি আবেগে যুক্তিহীন হোয়ে যান নি, প্রশ্ন কোরেছেন- কী ঐ তলোয়ারের হক? হকটা কি তা না জানলে কেমন কোরে তিনি তা আদায় কোরবেন? বিশ্বনবী (দঃ) যা চাচ্ছিলেন আবু দুজানা (রাঃ) তাই কোরলেন। যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন কোরলেন এবং তাকেই তাঁর তলোয়ার দিয়ে সম্মানিত কোরলেন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হোচ্ছে যুক্তিকে প্রাধান্য না দেওয়ায় মহানবী (দঃ) প্রত্যাখ্যান কোরলেন কাদের? একজন তাঁর শ্বশুর এবং ভবিষ্যত খলিফা, অন্যজন শ্রেষ্ঠ সাহাবাদের অন্যতম, এবং দু'জনেই আশারায়ে মোবাশশারাহর অন্তর্ভুক্ত, অন্যদিকে আবু দুজানা এসব কিছুই নন, একজন সাধারণ আনসার। তবু যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়ায় ঐ মহা সম্মানিত সাহাবাদের বাদ দিয়ে তাকেই সম্মানিত কোরলেন। প্রশ্ন হোচ্ছে- আবু দুজানার (রাঃ) আবেগ, বিশ্বনবীর (দঃ) প্রতি তার ভালোবাসা কি ওমর (রাঃ) বা যুবায়েরের (রাঃ) চেয়ে কম ছিল? না, কম ছিল না, তার প্রমাণ বিশ্বনবীর (দঃ) দেয়া তলোয়ারের হক তিনি কেমন কোরে আদায় কোরেছিলেন তা ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়।

আকলের বেশি কেউ কোন পুরস্কার পাবে না:

এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা কোরেছেন- আল্লাহর রসুল (দঃ) বোললেন- 'কোন মানুষ নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, ওমরা (এবনে ওমর (রাঃ) উল্লেখ কোরছেন যে ঐগুলি তিনি একে একে এমন বোলতে লাগলেন যে, মনে হোল কোন সওয়াবের কথাই তিনি (দঃ) বাদ রাখবেন না) ইত্যাদি সবই কোরল, কিন্তু কেয়ামতের দিন তার আকলের বেশি তাকে পুরস্কার দেয়া হবে না (এবনে ওমর (রাঃ) থেকে- আহমদ, মেশকাত)। রসুলাল্লাহ (দঃ) শব্দ ব্যবহার কোরেছেন আকল, যে শব্দটাকে আমরা বাংলায় ব্যবহার কোরি 'আক্কেল' বোলে, অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধি, সাধারণজ্ঞান, যুক্তি ইত্যাদি, আবু দুজানা (রাঃ) যেটা ব্যবহার কোরে নবীকে (দঃ) প্রশ্ন কোরেছিলেন তলোয়ারের কী হক? অর্থাৎ বিচারের

দিনে মানুষের সওয়াবই শুধু আল্লাহ্ দেখবেন না, দেখবেন ঐ সব কাজ বুঝে কোরেছে, নাকি গরু-বকরীর মত না বুঝে কোরে গেছে, এবং সেই মত পুরস্কার দেবেন, কিম্বা দেবেন না। অর্থাৎ কারণ ও উদ্দেশ্য না বুঝে বে-আক্কেলের মত নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, ইত্যাদি সব রকম সওয়াবের কাজ শুধু সওয়াব মনে কোরে কোরে গেলে কোন পুরস্কার দেওয়া হবে না। এই হাদিসটাকে সহজ বাংলায় উপস্থাপন কোরলে এই রকম দাঁড়ায়- 'বিচারের দিনে পাক্কা নামাজীকে আল্লাহ প্রশ্ন কোরবেন- নামাজ কায়েম কোরেছিলে? মানুষটি জবাব দেবে-হ্যাঁ আল্লাহ! আমি সারা জীবন নামাজ পড়েছি। আল্লাহ বোলবেন-ভাল! কেন পড়েছিলে? লোকটি জবাব দেবে- তুমি প্রভু। তোমার আদেশ, এই তো যথেষ্ট, তুমি হুকুম কোরেছ তাই পড়েছি। আল্লাহ বোলবেন- আমি হুকুম ঠিকই কোরেছি। কিন্তু কেন কোরেছি তা কি বুঝেছ? তোমার নামাজের আমার কি দরকার ছিল? আমি কি তোমার নামাজের মুখাপেক্ষী ছিলাম বা আছি? কি উদ্দেশ্যে তোমাকে নামাজ পড়তে হুকুম দিয়েছিলাম তা বুঝে কি নামাজ পড়েছিলে?" তখন যদি ঐ লোক জবাব দেয়- না। তাতো বুঝিনি, তবে মহানবীর (দ:) কথা মোতাবেক তার ভাগ্যে নামাজের কোন পুরস্কার জুটবে না।

আকিদাহীন হজ্বও গ্রহণযোগ্য নয়:

নামাজের মত আজ হজ্ব সম্বন্ধেও এই জাতির আকিদা বিকৃত হোয়ে গেছে। এই বিকৃত আকিদায় হজ্ব আজ সম্পূর্ণরূপে একটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার, আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করার পথ। আজকের দিনের একজন হাজীকে আল্লাহ যদি হাশরের দিনে প্রশ্ন করেন যে, "তুমি কেন হজ্ব কোরেছ?" তিনি নিশ্চয় জবাব দেবেন, "তোমার সান্নিধ্য লাভের জন্য হে আল্লাহ।" তখন আল্লাহ যদি পাল্টা প্রশ্ন করেন, "আমি তো সর্বত্র ছিলাম এবং আছি, সৃষ্টির প্রতি অণু-পরামাণুতে আমি আছি, তবে আমাকে ডাকতে, আমার সান্নিধ্যের জন্য এত কষ্ট কোরে দূরে যেতে হবে কেন? আমার নিজের আত্মা তোমার দেহের মধ্যেই ছিল, আমি তো প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বর্তমান ছিলাম, শুধু তাই নয়, আমি বোলেই দিয়েছিলাম যে- নিশ্চয়ই আমি তোমাদের অতি সন্নিকটে, আরও বোলেছিলাম, 'আমি (মানুষের) গলার রগের চেয়েও সন্নিকটে। তাহোলে আমার সান্নিধ্য পেতে এত দূরে এত কষ্ট কোরে যেতে হবে কেন?" যদি ঐ হাজী বলেন যে, "আমি হজ্বে গিয়েছি, কারণ ওখানে বায়তুল্লাহ শরীফ, তোমার ঘর"। তখন আল্লাহ বোলবেন, "ঘরের মালিকই যখন সঙ্গে আছেন তখন বহু দূরে তাঁর পাথরের ঘরে যাবার কি প্রয়োজন আছে? আর আসল হজ্ব তো আরাফাতের ময়দানে, আমার ঘর কাবায় নয়। আমার ঘর দেখানই যদি উদ্দেশ্য হোয়ে থাকে তবে কাবাকে হজ্বের আসল কেন্দ্র না কোরে কাবা থেকে অনেক দূরে এক খোলা মাঠকে কেন্দ্র কোরলাম কেন? আর যদি আমি আরাফাতের ময়দানেই বোসেও থাকি, সেখানে যেয়ে আমার সামনে তোমাদের উপস্থিত হবার জন্য বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত কোরে দিলাম কেন? যে কেউ যখন খুশি আরাফাতের মাঠে গিয়ে 'লাব্বায়েক' বোলে হাজিরা দিলেই তো হোয়ে যেত। তা না কোরে আমি আদেশ দিয়েছি বছরের একটা বিশেষ মাসে, একটা বিশেষ তারিখে আমার সামনে হাজির হবার। কেন? একা একা যেয়ে আমাকে ভালোভাবে ডাকা যায়, নাকি সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায়, অপরিচিত পরিবেশে, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রচণ্ড ভিড়ের ধাক্কাধাক্কির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভালোভাবে, মন নিবিষ্ট কোরে ডাকা যায়? কি উদ্দেশ্যে তোমাকে হজ্ব কোরতে হুকুম দিয়েছিলাম তা বুঝে কি হজ্ব কোরেছিলে?" তখন যদি ঐ লোক জবাব দেবে- না। তাতো বুঝি নি, তবে মহানবীর (দ:) কথা মোতাবেক তার ভাগ্যে হজ্বেরও কোন পুরস্কার জুটবে না।

সকল আমলের পুরস্কার পেতে পূর্বশর্ত উদ্দেশ্য বোঝা:

নামাজ এবং হজ্বের মত অন্যান্য সব পুণ্য-সওয়াবের কাজের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। আর যে মানুষ আল্লাহর প্রশ্নের জবাবে বোলবে- হ্যাঁ আল্লাহ, আমি বুঝেই নামাজ পড়েছি। তোমার রসুলকে (দ:) তুমি দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলে সমস্ত মানব জাতির উপর তোমার দেয়া জীবন-ব্যবস্থা, দীনকে সংগ্রামের মাধ্যমে জয়ী কোরে পৃথিবী থেকে সব রকম অন্যায়, শোষণ, অবিচার, যুদ্ধ ও রক্তপাত দূর কোরে শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়ে। তাঁর একার পক্ষে এবং এক জীবনে এ কাজ সম্ভব ছিল না। তাঁর প্রয়োজন ছিল একটা জাতির, একটা উম্মাহর, যে জাতির সাহায্যে এবং সহায়তায় তিনি তাঁর উপর দেয়া দায়িত্ব পালন কোরতে পারেন এবং তাঁর তোমার কাছে প্রত্যাবর্তনের পর যে উম্মাহ তাঁর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, যে পর্যন্ত না তাঁর দায়িত্ব পূর্ণ হয় এবং এবলিস তোমাকে দুনিয়ায় মানবজাতির মধ্যে ফাসাদ আর রক্তপাতের চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, তাতে তুমি জয়ী হও। আমার সৌভাগ্য, তোমার অসীম দয়ায়, আমি সেই উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। তোমার আদেশ নামাজের উদ্দেশ্য ছিল আমার সেই রকম চরিত্র সৃষ্টি করা, সেই রকম আনুগত্য, শৃঙ্খলা শিক্ষা করা যে চরিত্র ও শৃঙ্খলা হোলে আমি তোমার নবীর (দ:) দায়িত্ব সম্পাদনে তাঁর সাহায্যকারী হোয়ে সংগ্রাম কোরতে পারি। তাই আমি বুঝেই নামাজ পড়েছি। এই লোক পাবে তার নামাযের পূর্ণ পুরস্কার। একইভাবে যে হাজী আল্লাহর প্রশ্নের জবাবে বোলবে যে, "হে আল্লাহ! আমি বুঝেছি যে তোমার ঘর ক্বাবাকে মোসলেম উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক কোরেছ এবং হজ্বকে কোরেছ মোসলেম উম্মাহর মহাসম্মেলন। তুমি চেয়েছ বছরে একবার আরাফাতের মাঠে পৃথিবীর সমস্ত মোসলেমদের নেতৃস্থানীয়রা একত্র হোয়ে জাতির সর্বরকম সমস্যা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি সর্বরকম সমস্যা, বিষয় নিয়ে আলোচনা কোরবে, পরামর্শ কোরবে, সিদ্ধান্ত নেবে। অর্থাৎ স্থানীয় পর্যায় থেকে ক্রমশঃ বৃহত্তর পর্যায়ে বিকাশ কোরতে কোরতে জাতি পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু মক্কায় একত্রিত হবে। এটাই হজ্ব। এই মহাজাতিকে ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রাখার জন্য হজ্ব তোমার দেওয়ার চমৎকার একটি প্রক্রিয়া। তাই আমি বুঝেই হজ্ব কোরেছি।" এই লোক পাবে তার হজ্বের পূর্ণ পুরস্কার। অন্যান্য সব রকম কাজের (আমলের) ব্যাপারেও তাই। কাজেই সকল আমলের পুরস্কার পেতে হলে এই দীনের যাবতীয় আকিদা জানা আবশ্যক। ■

স্বাধীন বাংলার ইতিহাসের সাথে এমামুয্যামানের যোগসূত্র

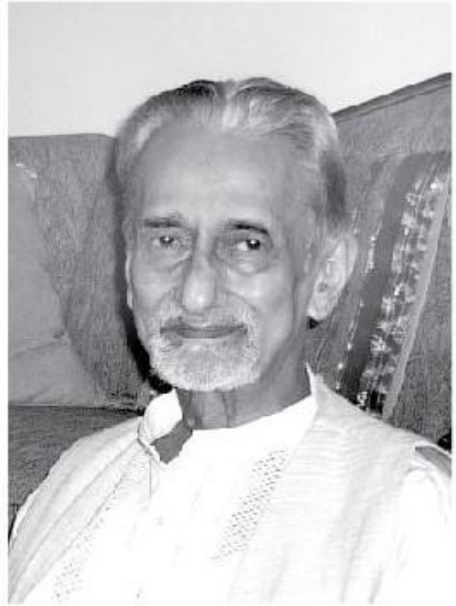

মাননীয় এমামুয্যামান ছিলেন ঐতিহ্যবাহী পন্নী জমিদার পরিবারের সন্তান। ইতিহাসের পাঠকমাত্রই তাঁর পরিবারের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস জানেন। সুলতানী যুগে এবং মোগল আমলে এ পরিবারের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন অত্র এলাকার শাসক। এমন কি তারা দীর্ঘকাল বৃহত্তর বাংলার (তদানীন্তন গৌড়) স্বাধীন সুলতান ছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতির সঙ্গে এই পরিবারের কীর্তি এক সূত্রে গাঁথা। বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান ছিলেন এমামুয্যামানেরই পূর্বপুরুষ দাউদ খান পন্নী (কররানি)। এ ব্যাপারে একটি ভুল ইতিহাস চালু আছে, বলা হোয়ে থাকে বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান ছিলেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা, কিন্তু এটি একটি ঐতিহাসিক ভুল। এ বিষয়ে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক জনাব হায়দার আলী চৌধুরী রচিত 'পলাশী যুদ্ধোত্তর আযাদী সংগ্রামের পাদপীঠ' নামক ইতিহাস গ্রন্থে তিনি উল্লেখ কোরেছেন যে, "স্বাধীন নবাব বোলে যে কথাটি প্রচলিত তা ঐতিহাসিক সত্য নয়! স্বাধীন নবাব কথাটি নাট্যকারদের লেখা। কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। নবাব কোনদিন স্বাধীন হয় না (পৃষ্ঠা: ৭৭)"। তাঁর এই কথা অত্যন্ত যৌক্তিক, কারণ নবাব শব্দটি আরবি নায়েবের অন্যতম রূপ। আর নায়েব মানেই শাসকের প্রতিনিধি। সিরাজ-উদ-দৌলা ছিলেন মোগল শাসকদের নিয়োজিত সুবেদার। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে বাংলার শাসনে সর্বশেষ স্বাধীন শাসনকর্তা সিরাজ-উদ-দৌলা নন। সিরাজ-উদ-দৌলা ও তার পূর্বসূরী নবাব আলীবর্দী খানসহ সবাই ছিলেন তৎকালীন দিল্লির মসনদে আসীন মুঘল সম্রাটদের অনুগত প্রতিনিধি। প্রকৃতপক্ষে বাংলার স্বাধীন শাসক এবং স্বাধীনতা গত হয় আরো অনেক আগে। অনুসন্ধিৎসু পাঠককে সত্যিকার ইতিহাস জানতে ফিরে যেতে হবে আরো পেছনে।

মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর পূর্বপুরুষ দাউদ খান পন্নীর পরাজয় এবং হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই মূলত বাংলার শাসন ক্ষমতা থেকে 'স্বাধীন' শাসকের অবসান ঘটে। সুতরাং ১৭৫৭ সালের ২৩ ই জুন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা নন, ১৫৭৬ সনের ১২ জুলাই বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান দাউদ খান পন্নীর অবসানের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। এরপর শুধু পন্নী বংশই নয়, কোন শাসকই আর স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন কোরতে সক্ষম হন নি। পন্নী রাজবংশের পরাজয়ের পর বারো ভূঁইয়াখ্যাত পন্নীদের অনুগত দৃঢ়চেতা কমাণ্ডার ও জমিদারগণ দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারকে অস্বীকার করে আঞ্চলিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরে অবশ্য তারাও মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার কোরতে বাধ্য হন। মুঘলদের অধীনস্থ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের পর ধীরে ধীরে শাসন ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চোলে যায়।

ব্যক্তিজীবন:

আমাদের এই উপমহাদেশসহ সমগ্র পৃথিবী যখন খ্রিস্টান ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের যাতাকলে নিস্পেষিত বিশেষ কোরে মোসলেম বিশ্ব যখন ইহুদি-খ্রিস্টানদের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহ এই জাতির উপর সদয় হোলেন, তিনি পৃথিবীতে পাঠালেন তাঁর

মনোনীত একজন মহামানব, এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে। মাননীয় এমামুয্যামান ১৫ শাবান ১৩৪৩ হেজরি মোতাবেক ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ শেষ রাতে জন্মগ্রহণ করেন। এমামুয্যামানের রোয়েছে এক কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবন-ইতিহাস। তাঁর শৈশব কাটে করটিয়ার নিজ গ্রামে। ১৯৪২ সনে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। কোলকাতার ইসলামিয়া কলেজে তাঁর শিক্ষালাভের সময় পুরো ভারত উপমহাদেশ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল আর কোলকাতা ছিলো এই বিপ্লবের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। আন্দোলনের এই চরম মুহূর্তে তরুণ এমামুয্যামান আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকীর প্রতিষ্ঠিত 'তেহরীক এ খাকসার' নামক আন্দোলনে যোগ দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। সেই সুবাদে তিনি এই সংগ্রামের কিংবদন্তীতুল্য নেতৃবৃন্দের সাহচর্য লাভ করেন যাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্, অরবিন্দু বোস, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী অন্যতম। ছোট বেলা থেকেই তাঁর ছিল শিকারের শখ। শিকারের লোমহর্ষক সব অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর লেখা 'বাঘ-বন-বন্দুক' (১৯৬৪) নামক বইটি খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়। ক্রীড়াঙ্গনেও তিনি ছিলেন একজন অগ্রপথিক। ১৯৫৬ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন।

১৯৬৩ সনে এমামুয্যামান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য অর্থাৎ এম.পি. নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান আবু সাঈদ চৌধুরী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর রোগীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ নজরুল একাডেমির একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ১৯৬৩ সনে তিনি করটিয়ায় হায়দার আলী রেডক্রস ম্যাটার্নিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করেন যার দ্বারা এখনও উক্ত এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হোচ্ছেন। পরবর্তীতে তিনি সা'দাত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন নামে প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নয়নের জন্য একটি দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন সত্যের মূর্ত প্রতীক। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন সত্য সন্ধান এবং সত্যের জন্য লড়াই কোরে গেছেন। তাঁর ৮৬ বছরের জীবনে একবারের জন্যও আইনভঙ্গের কোন রেকর্ড নেই, নৈতিক স্খলনের কোন নজির নেই। আধ্যাত্মিক ও মানবিক চরিত্রে বলীয়ান এ মহামানব সারাজীবনে একটিও মিথ্যা শব্দ উচ্চারণ করেন নাই। ১৬ জানুয়ারি ২০১২ ঈসায়ী এই মহামানব প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে পর্দাগ্রহণ করেন।

মোসলেম জাতি সম্পর্কে এমামুয্যামানের ভাবনা:

ভেদাভেদ আর হানাহানিতে লিপ্ত অন্য জাতিগুলি দ্বারা শোষিত ও লাঞ্ছিত মোসলেম জাতি সম্পর্কে এমামুয্যামান ভাবতেন ছোট বয়স থেকেই। ছোটবেলায় যখন তিনি মোসলেম জাতির পূর্ব ইতিহাসগুলি পাঠ করেন তখন থেকেই তাঁর মনে কিছু প্রশ্ন নাড়া দিতে শুরু করে। প্রশ্নগুলি তাঁকে প্রচণ্ড দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দেয়, তিনি এগুলির জবাব জানার জন্য ব্যাকুল হোয়ে ওঠেন। তাঁর শৈশবকালে প্রায় সমগ্র মোসলেম বিশ্ব ইউরোপীয় জাতিগুলির দ্বারা সামরিকভাবে পরাজিত হোয়ে তাদের অধীনতা মেনে নিয়ে জীবনযাপন কোরছিল। মোসলেম জাতির অতীতের সাথে বর্তমান অবস্থার এই বিরাট পার্থক্য দেখে তিনি রীতিমত সংশয়ে পড়ে যান যে এরাই কি সেই জাতি যারা সামরিক শক্তিতে, ধনবলে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি অঙ্গনে যারা ছিল সকলের অগ্রণী? কিসের পরশে এই জাতি ১৪০০ বছর পূর্বে একটি মহান উম্মাহয় পরিণত হোয়েছিল, আর কিসের অভাবে আজকে তাদের এই চরম দুর্দশা, তারা সকল জাতির দ্বারা পরাজিত, শোষিত, দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, দুনিয়ার সবচেয়ে হত-দরিদ্র ও অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত, সব জাতির দ্বারা লাঞ্ছিত এবং অপমানিত?

সত্যের সন্ধান লাভ:

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি ধীরে ধীরে অনুধাবন কোরলেন কি সেই শুভঙ্করের ফাঁকি। ষাটের দশকে এসে তাঁর কাছে এই বিষয়টি দিনের আলোর মত পরিষ্কার হোয়ে ধরা দিল। তিনি বুঝতে পারলেন কোন পরশপাথরের ছোঁয়ায় অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আরবরা যারা পুরুষাণুক্রমে নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে মগ্ন ছিলো, যারা ছিল বিশ্বের সম্ভবত সবচেয়ে অবহেলিত জাতি, তারাই মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এমন একটি ঐক্যবদ্ধ, সুশৃংখল, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিতে রূপান্তরিত হোল যে তারা তখনকার দুনিয়ার দু'টি মহাশক্তিকে *(Super power)* সামরিক সংঘর্ষে পরাজিত কোরে ফেলল, তাও আলাদা আলাদা ভাবে নয় - একই সঙ্গে দু'টিকে,